অলংকরণ: পিয়ালি বালা

উপন্যাস

বিষাদ পেরিয়ে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আবার ল্যান্ডফোনটা বাজছে। বাথরুম থেকে শুনতে পাচ্ছিল অনুব্রত। সকাল থেকে আজ এই এক হয়েছে। ক্ষণে-ক্ষণে কিড়িং-কিড়িং! কাগজে বিজ্ঞাপন বেরতে না-বেরতে মহা উৎপাত শুরু হল তো! শান্তিতে প্রভাতী কোষ্ঠসাফটা সারবে, তারও জো নেই! সকালের প্রথম দরকারি কাজটিতে বিঘ্ন ঘটলে গোটা দিনটাই চটকে যাবে না?

যাক, থেমেছে আওয়াজ। অনুব্রত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ধীরেসুস্থেই বেরল বাথরুম থেকে। একাত্তর বছর বয়স হল, আর কি হুটোপাটি করা পোষায়!

শোওয়ার ঘর পেরিয়ে অনুব্রত বসার ঘরটিতে এল। কপালে বিরক্তির ভাঁজ। ঘাড়ে চেপে বিজ্ঞাপনটি যিনি দেওয়ালেন, তিনি এখনও বেপাত্তা। সেই কোন ভোরে বেরিয়েছে, আটটা বেজে গেল, এখনও মর্নিংওয়াক থেকে ফেরার নাম নেই। হয়তো আজ কোনও সখীর জন্মদিন, মিষ্টি খাওয়াখাওয়ি চলছে। কিংবা ব্যায়ামের নামে হাত ছোড়াছুড়ি। নয়তো বা মেয়েদের যা চিরকালীন অভ্যেস, জমেছে পরনিন্দা-পরচর্চা। এদিকে ঘরের বুড়োটা যে আজ সকাল থেকে জ্বালাতন হতে পারে, সেই হুঁশটাই মহারানির নেই!

সেন্টার টেবিলে দু' খানা খবরের কাগজ। বাংলা, ইংরেজি। বাংলা কাগজখানা খুলে আর একবার বিজ্ঞাপনটা দেখল অনুব্রত। নাঃ, ভাষা মোটামুটি ঠিকই আছে। টুইন শেয়ারিং বেসিসে মহিলা পেয়িং গেস্ট চাই। ছাত্রী বাঞ্ছনীয়। ছোট্টর উপর এইটুকুই তো যথেষ্ট!

কিন্তু বাড়িতে পেয়িং গেস্ট ঢোকানোর জন্য হঠাৎ কেন খেপে উঠল করবী? টাকাপয়সার তো তাদের যেমন প্রয়োজন নেই। ডিভিসি থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার-এর পোস্টে রিটায়ার করা অনুব্রত মাস গেলে যা পেনশন পায়, তাতে তো স্বচ্ছন্দে চলে যায় দুটো প্রাণীর। আচমকা বিপদ-আপদ সামাল দেওয়ার মতো সঞ্চয়ও আছে ব্যাঙ্কে। তা ছাড়া অফিসারদের থাকার জন্য একতলাটা লিজ নিয়ে রেখেছে ব্যাঙ্ক। সেখান থেকেও মাস মাস একটা মোটা অঙ্কই আসে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার এগারো বছর পরও এখনও অনুব্রতকে হাজার পঞ্চাশেক টাকা বার্ষিক আয়কর দিতে হয়। এতেই কি মালুম হয় না অনুব্রত কতটা স্বচ্ছল? তা হলে করবীর মাথায় খেয়ালটা চাপল কেন?

ছেলেদের উপর অভিমান? তারা দূরে-দূরে সরে গেছে বলে? ধুস, তারা তো কবে থেকেই বাইরে। রাজা সিডনিতে আছে প্রায় এগারো বছর। নাগরিকত্বও পেয়ে গেছে সেখানে। বুদ্ধিমান ছেলে, আর সে ফিরবেই না এ দেশে। কেনই বা ফিরবে? কী আছে কলকাতায়? ধোঁয়া-ধুলো, মিটিং-মিছিল, ভিখিরি-হকার ছাড়া? চাটার্ড পাস রাজা এখানে যে একটা নিজস্ব ফার্ম খুলবে, সেরকম ব্যবসাবাণিজ্যই বা কোথায়? তার চেয়ে বিদেশে ব্যাঙ্কের চাকরিতে কী নিশ্চিন্ত জীবন, বিলাস যেন উপচে-উপচে পড়ছে! এই বয়সেই প্যারাম্যাটা নদীর ধারে কী চমৎকার ছোট্ট একটা বাংলো কিনেছে, আহা! ওই বাংলোর লনে দাঁড়ালে মনোরম নিসর্গে দু' চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। আর ছোটুও যে কম্পিউটর ইঞ্জিনিয়ারিং করে কলকাতায় হেজে মরবে না, এ-ও তো অবধারিতই ছিল। তাও তো সে বিদেশে পাড়ি জমায়নি, বেঙ্গালুরুতেই থিতু হয়েছে। বিদেশ যাওয়ার তার বোধ হয় খুব একটা বাসনাও নেই। থাকলে কি সত্তর-বাহাত্তর লাখ টাকা খরচ করে বেঙ্গালুরুতে ফ্ল্যাট কেনে? মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে?

ছেলেদের উপর মোটেই তো তেমন বীতরাগ নয় করবী। গত বছরই তো খুব আনন্দ করে ঘুরে এল সিডনি থেকে। মে মাসে নতুন ফ্ল্যাটের গৃহপ্রবেশ হল ছোট্টর, সেখানে গিয়েও তো কত হইহল্লা! শ্রাবন্তীর ঘর সাজানোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিজেই শপিং মল থেকে কত শো-পিস কিনে দিয়ে এল...

টেলিফোন বাজছে আবার। হাত বাড়িয়ে অনুব্রত রিসিভার টানল, "হ্যালো?"

ওপারে বামাকণ্ঠ, আজকের আনন্দবাজারে একটা পেয়িংগেস্টের বিজ্ঞাপন...

"হ্যাঁ, আমিই দিয়েছি," কাঠ-কাঠ গলায় অনুব্রতর প্রশ্ন, "বলুন, কী জানতে চান?"

"আপনারা মান্থলি কীরকম চার্জ নিচ্ছেন?"

প্রশ্নটা বিঁধল অনুব্রতকে। কী ভেবেছে মহিলা? সে কি পেয়িং গেস্ট বসিয়ে খায়? চটে উঠতে গিয়েও অনুব্রত নিজেকে সামলাল। সংক্ষেপে বলল, "পাঁচ হাজার।"

"ঘরের সাইজ কেমন? আই মিন, দু'জন কমফর্টেবলি থাকতে পারবে তো?"

"তা তো ফোনে বোঝানো যাবে না। এসে দেখতে হবে।"

"লোকেশনটা কোথায়?"

"সল্টলেক। সেক্টর ওয়ান। বি ডি মার্কেটের কাছে।"

"শ্যামবাজার থেকে কত নম্বর বাস যায়?"

কী উদ্ভট প্রশ্ন! শ্যামবাজার থেকে আদৌ কোনও বাস তাদের বাড়ির দিকে আসে কিনা, অনুব্রতর জানা নেই। অজ্ঞানতা ঢাকতে গলা খানিক নরম করল অনুব্রত। কেজো সুরে বলল, "দশটার পরে ফোন করুন। তখন সব জানতে পারবেন।"

"কেন? এখন বলার অসুবিধে আছে?"

"হ্যাঁ। ফোন দশটার পর করলেই ভাল হয়।"

বলেই রিসিভার ঝপাং। ওফ, কী জেরা! প্রশ্ন করার ধরন শুনলেই বোঝা যায়, মহিলা যথেষ্ট ঢ্যাঁটা। মহিলা, না মেয়ে? গলাটা তো খুব একটা কচি বলে মনে হল না। কী যে সব উতপটাং ঝামেলা আমদানি করছে করবী! সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো বুঝি একেই বলে!

প্রতিমা এসেছে ঘরে। রাতদিনের কাজের লোক। ছাদেই তার আস্তানা। বাড়ি তোলার সময়ে বেশ একটা আজব পরিকল্পনা করেছিল অনুব্রত। দুই ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে বড়সড় পরিবারটা থাকবে একতলা দোতলায়। পাছে বসবাসের জায়গা কম পড়ে, তাই রান্নাঘরটা বানানো হয়েছিল ছাদে। সঙ্গে খাওয়ার জায়গাও। রান্না এখনও উপরেই হয় বটে, তবে ডাইনিং টেবিল নেমে এসেছে দোতলায়। শুধু দোতলার জন্যই কেনা হয়েছে আর একখানা ফ্রিজও। তিনতলায় আহারের স্থানটি এখন মধ্যচল্লিশ প্রতিমার কোয়ার্টার্স। বছরপনেরো থাকার সুবাদে সে-ও প্রায় এবাড়িরই একজন।

প্রতিমা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আর এক কাপ চা খাবেন মামা?"

"দিবি?"

"বললেই করি। মামীও তো এখনই এসে যাবে।"

"এলেই ভাল। ফোনের ঠেলায় আমার যা অবস্থা যাচ্ছে..."

"কীসের ফোন?"

"তুই জানিস না? মামী তোকে কিছু বলেনি?" অনুব্রত সূক্ষ্ম একটু রাজনৈতিক চাল দিল, "তোর ঘাড়ে তো চাপ বাড়তে চলেছে রে!"

"কেন?"

"দু'-দু'জন মেয়ে আসছে বাড়িতে। পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবে। তাদের রান্নাবান্না, দেখভাল..."

"ও, সে তো আমি জানি। প্রতিমা মুচকি হাসল, বাড়তি কাজের জন্য মামী আমার মাইনে বাড়িয়ে দেবে বলেছে।"

অনুব্রত হতাশ। নাঃ, প্যাঁচপয়জারে করবীর সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন। কাজে যখন নামে, আটঘাট বেঁধেই এগোয়। সাধে কি রাজা, ছোট্ট কে কী পড়বে, কোন লাইনে যাবে, সেসব নিয়ে কোনও দিন ভাবতে হয়নি অনুব্রতকে? প্ল্যান্ট, বয়লার, কুলিং টাওয়ার, টার্বাইনের জগতে দিব্যি মশগুল থাকতে পেরেছে! সাংসারিক কোনও পিছুটান ছাড়াই। বড় ছেলের প্রথম বিয়েটা তো একা কাঁধে তুলে পার করেছিল করবী। বউভাতের খুঁটিনাটি আয়োজন, কেটারার ঠিক করা। নেমন্তন্নর লিস্ট, আত্মীয়স্বজনদের কাছে কোথায় রাখবে তার বন্দোবস্ত, সবই তো আগেভাগে সারা। অতএব পেয়িং গেস্টদের হ্যাপা সামলানোর ছকও নিশ্চয়ই কষেই রেখেছে।

প্রতিমা এখনও দাঁড়িয়ে। অনুব্রত ভুরু কুঁচকে বলল, "চা, চাটা করে আন।"

"একটা কথা ছিল মামা। বলব? রাগ করবেন না?"

"কী?"

"জলখাবারটা খেয়ে আজ একবার আপনাকে বাজার যেতে হবে।"

"কালই তো এনে দিলাম। ইলিশ, কাতলা, ডিম, মুরগি...একদিনে ফ্রিজ খালি হয়ে গেল?"

"না, না। মুরগির স্টু বানাতে বলেছে মামী। বিনস-গাজর একটুও নেই!"

"মোড়ের মাথায় সবজিওয়ালাটা বসছে না?"

"ওর কাছে সব শুকনো-শুকনো। মরকুট্টে।"

"এই বর্ষাকালে কে তোমায় তাজা বিনস-গাজর দেবে?"

"মুসাম্বিও লাগবে যে। আর একখানা ভাল দেখে পাকা পেঁপে।"

"কাল বলে দিসনি কেন?"

"পেঁপে অনেকটা ছিল যে। আজ সকালে ফ্রিজ খুলে দেখি পচে গেছে। যা বিচ্ছিরি গরম!"

পাল্টা মন্তব্যের অবকাশ পেল না অনুব্রত, সিঁড়িতে কোলাপসিবল গেট খোলার শব্দ। করবী ফিরল। পরনে হাল্কা বাসন্তী রঙের সালোয়ার কামিজ, পায়ে কেডস।

আজকাল রোজই এরকম প্রভাতী পোশাকে করবীকে দেখে অনুব্রত। একটু যেন মুগ্ধতাও জাগে। মনে হয় ৪২ বছর আগে বিয়ে করা করবী যেন এখনও ছেষট্টিতে পৌঁছয়নি, বয়স তার থমকে আছে অনেক আগেই। চিরকাল শাড়িতে দেখা বউটিকে একটু অচেনাও ঠেকে যেন! একই সঙ্গে মনে হয়, বউয়ের দৌলতে তারও বুঝি বয়স খানিকটা কমে গেছে। হালকাপুলকা রসিকতাও জোড়ে তখন। তরুণদের মতোই। আশ্চর্য, বাড়িতে তো বহুকাল ধরেই করবী নাইটি-কাফতান পরছে, তখন তো ঠিক এমনটা লাগে না অনুব্রতর? অভ্যাস-অনভ্যাসের ব্যাপার? হয়তো বা।

আজ অবশ্য অনুব্রত সেভাবে নজরই করল না যেন। সরাসরি বলল, "জব্বর ফাঁসিয়ে গেছো বটে আজ।"

করবী জবাব দিল না। সোফার হাতলে বসে কচি মেয়ের মতো কেডস খুলছে। ফিতে খুলতে-খুলতে প্রতিমাকে বলল, "কী রে, ব্রেকফাস্টে আজ কী খাওয়াচ্ছিস?"

"কী দেব বল? টোস্ট-ওমলেট-কলা? চাও তো পোচও করতে পারি।"

"বড্ড বেশি ডিম খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। এই বয়সে প্রোটিন নেওয়াটা একটু কমানো দরকার।"

"তা হলে?"

"তুই বরং আজ রুটি-আলুভাজা কর। ভাজাতে কম তেল দিবি। সঙ্গে কয়েকটা কাঁচালঙ্কা চিরে দিস, যাতে একটু ঝাল-ঝাল ভাব আসে।"

"চা-টা করেই বসিয়ে দিচ্ছি।"

"এখন আবার চা কেন? জলখাবারের পর একবারে দিস।"

ব্যস, হয়ে গেল! করবী দেবী যখন একবার নির্দেশ ঝেড়েছে, তখন প্রতিমার ঘাড়ে ক'টা মাথা, গ্যাসে কেটলি বসায়!

সুতরাং মাথা নেড়ে চলে গেল প্রতিমা। মোজাসুদ্ধ কেডস বাইরে রেখে এসে করবী সোফায় বসল। টাং করে ঝুঁটি থেকে গার্ডার খুলে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, "ক'টা ফোন এল?"

অনুব্রত ইংরেজি কাগজটা টানল। হেডলাইনে চোখ রাখার ভান করে বলল, "গোটাপাঁচেক হবে। অত গুনিনি।"

"দরকরি তথ্যগুলো তাদের দিয়েছ? মাসে কত পড়বে, বিনিময়ে কী-কী পাবে, কোন-কোন নিয়ম তাদের মানতে হবে..."

"অত কিছু আমি বলতে পারব না। দশটার পর থেকে আবার তারা ফোন করবে, তুমি বাতচিত করে নিও," গলাটা ঈষৎ রুক্ষ হল অনুব্রতর, "আমি বললে তো হবে না। ফাইনাল তো করবে তুমি। নয় কি?"

অনুব্রতর বিরক্তিটাকে আমলই দিল না করবী। সহজ সুরে বলল, "হ্যাঁ, বাছব তো আমিই। কাজটা খানিক এগিয়ে থাকত, এই যা। অবশ্য জানতাম, তুমি এরকমই করবে।"

"বিজ্ঞাপনে তোমার মোবাইল নাম্বারটা দিতে বারণ করলে কেন! অ্যাঁ? আমায় মধ্যিখানে ফেলে ঠোসার জন্য?"

"আঃ, বড্ড ফালতু কথা বল। যাকে-তাকে মোবাইল নাম্বার দেওয়া যায়। কত আজেবাজে ফোন আসবে তার ঠিক আছে?"

কী যুক্তি! বাড়ির নম্বরে উল্টোপাল্টা ফোন আসাটা যেন কোনও ব্যাপারই নয়! আসলে বাড়িতে এক নিষ্কর্মা লোক আছে তো, ফোনাফুনির ঝঞ্ঝাটটা তার উপর দিয়েই যতটা চালানো যায় আর কি। কিন্তু ওইটি আর হচ্ছে না। সকালে খানিকটা মূর্খামি হয়ে গেছে, আগামি সাতদিনে ভুলেও আর ল্যান্ডলাইন ছোঁবে না অনুব্রত।

ভাবতে না-ভাবতেই আবার টেলিফোন ঝনঝন! করবীর দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হেনে অনুব্রত খবরের কাগজে চোখ নামাল। কান কিন্তু খাড়া। শুষে নিচ্ছে এপারের সংলাপ। ভারী নরম, কিন্তু ঋজু স্বরে কথা বলছে করবী। কখনও চুপচাপ শুনছে, হুঁ হ্যাঁ করছে, অকারণ বাক্যব্যয়ে না গিয়ে ওপ্রান্তকে শুনিয়ে দিল পেয়িং গেস্ট থাকার শর্তাবলী। সম্ভবত আজই সন্ধেয় দেখা করতে আসছে মেয়েটি, এবাড়ির অবস্থানটিও নিখুঁত বুঝিয়ে দিল তাকে। সল্টলেকের রাস্তাঘাট চেনা সোজা নয়, গুলিয়ে ফেলার সমূহ আশঙ্কা। তাই বোধ হয় জানিয়ে দিচ্ছে পথের প্রতিটি দিকচিহ্ন।

৭১ বছর বয়সে পৌঁছে বিস্ময়বোধের কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকে! তবু করবী এখনও অনুব্রতকে অবাক করে বইকি! কী সহজ ছন্দে ফোনালাপ চালাচ্ছে, বোঝার উপায়ই নেই ও প্রান্তের মানুষ তার চেনা, না অচেনা। কিন্তু তার প্রতিটি বাক্য উচ্চারণে অদ্ভুত এক ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠছে। কোত্থেকে যে করবী এটা পেল! কোনওদিন চাকরি বাকরি করেনি, আদ্যন্ত এক গৃহবধূ, দুই ছেলেকে মানুষ করা আর ঘরদোর সামলেই জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে। বর্হিজগতের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বড় একটা, নির্দিষ্ট প্রয়োজন ছাড়া দোকানবাজারে যাওয়ার অভ্যেসও নেই তেমন, তবু কীভাবে যেন এক আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে করবীর মধ্যে। এমনও তো বলা যাবে না গত কয়েক বছর প্রাতঃভ্রমণের সূত্রে জোটা বন্ধুদের সঙ্গগুণে এই প্রত্যয়ী ভাবটা এসেছে। তাদের সঙ্গে করবী কতটুকুই বা মেশামিশি করে? এই সকালেই যা...ক্বচিৎ কখনও তাদের এক-আধজন আসে বাড়িতে, করবী তো যায়ই না। সত্যি কথা বলতে কি, সপ্তাহে-দু'সপ্তাহে একবার নিজের মাকে দেখে আসা ছাড়া কোথাও তো বেরোয়ই না। আসলে ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটা করবীর সহজাত। সাড়ে তিন যুগ ধরে ঘর করতে-করতে অনুব্রত বুঝি তা হরদমই টের পেয়েছে। নইলে কি শ'য়ে-শ'য়ে তেএঁটে লেবার চরানো অনুব্রত মৈত্র বউয়ের সামনে এলে খানিকটা সঙ্কুচিত হয়ে যায়? মনে-মনে এঁটে উঠতে পারে না বলেই তো।

করবীর কথাবার্তা শেষ। ফোন রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আবার ঝনঝন। ফের সেই একই সুরে, একই বিষয় আউড়ে চলেছে করবী। একেও কি সন্ধেবেলা আসতে বলল? ইস, বৈকালিক ভ্রমণের পর সন্ধেটা আজ অনুব্রতর মোটেই ভাল কাটবে না। কত জন যে বাড়িতে হানা দেবে, কে জানে!

এবার অবশ্য ফোনটা ছেড়ে করবী বেরল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী যেন চিন্তা করছে। হঠাৎ আপনমনে বলে উঠল, "এঃ, একটা ভুল হয়ে গেল।"

শুধু একটা? গোটা পরিকল্পনাটাই তো ভুলভাল। বলতে গিয়েও গিলে নিল অনুব্রত। চোখ তেরচা করে বলল, "কী ভুল?"

"সব্বাইকে সরাসরি আসতে না বলে একটা বায়োডেটা চেয়ে নিলে হত। সেখান থেকে ঝাড়াইবাছাই করে নয় ডাকতাম। তোমার ই-মেল আইডিটা দিয়ে দিলেই তো..."

"আবার আমারটা কেন? তোমারও তো অ্যাকাউন্ট আছে।"

"তা অবশ্য ঠিক। পেয়িং গেস্টের প্রস্তাবটা যখন আমার, তখন ছোটখাটো দায়গুলো তোমার উপর চাপাবই বা কেন," করবী শান্ত স্বরেই বলল, "তবে কয়েকটা কাজ তো তোমাকেই করতে হবে।"

"যেমন?"

"কোলাপসিবল গেটের তালাটার দু' খানা এক্সট্রা চাবি বানাতে হবে। ছোটুর ঘরের ইয়েল লকটারও..."

"ছোটুর ঘরটা দেওয়াই সাব্যস্ত করেছ তা হলে? অত সুন্দর ইস্ট ফেসিং রুম..."

"পয়সা নিয়ে থাকতে দিচ্ছি। একটু আলো-বাতাসওয়ালা ঘর না হলে চলে?"

"ভাল। তোমার যা প্রাণ চায় করো। কিন্তু ও ঘরের মালপত্রগুলো কী হবে? আশা করি, ছোটুর খাট-আলমারি-ওয়র্ডরোব-বুকশেল্‌ফগুলো ভাড়া খাটাচ্ছ না?"

"খাট তো জোড়া হয়েছে। দু'খানা সিঙ্গল বেড। ওগুলো ওখানেই থাকবে। আলাদা করে দেব। বাকি আসবাবগুলোর দেখি কী ব্যবস্থা করা যায়। ভাবছি ওয়র্ডরোবটা ঢোকাব রাজার ঘরে। আর আলমারিটা স্টাডিতে।"

অর্থাৎ ঘরগুলো ক্রমশ একটি গুদামে পরিণত হতে চলেছে। মনে-মনে বলল অনুব্রত। গলা থেকে খানিকটা ঝাঁঝ বেরিয়েও এল, "আর ছোটুরা এখন কলকাতায় এলে কী হবে? এই ধরো, পুজোতেই যদি আসে?"

"প্রথমেই শুনে রাখো, এবছর ওরা কলকাতামুখো হচ্ছে না। শ্রাবন্তীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। পুজোর সময়ের বদলে ছোটু এবছর ছুটি নেবে ডিসেম্বরে। শ্রাবন্তীর স্কুলে যখন ক্রিসমাসের ছুটি চলবে। পুচকুনেরও তখন ভেকেশন। ওরা তিনজন এবছর সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক বেড়াতে যাবে।"

"অ।"

"তা ছাড়া ওদের থাকা নিয়ে ভাবতে হবে না। রাজার ঘর আছে, ছোটুরা এলেও মিলেমিশে কুলিয়ে যাবে। আর যদি ছোটুরা খুব অসুবিধে ফিল করে, শ্রাবন্তীর বাপের বাড়ি গিয়ে না হয় উঠবে।"

কী নির্বিকারভাবে করবী বলে দিল কথাটা। অথচ এই ছোটু-ছোটু করেই না পাগল ছিল এক সময়! সাধে কি বলে, মেয়েমানুষের মতি বোঝা ভার।

তবু ক্ষীণকণ্ঠে অনুব্রত প্রতিবাদ জুড়ল, "এটা কী বলছ? ছোটুর শ্বশুরবাড়ি ওঠাটা কি ভাল দেখায়? নিজের বাড়ি থাকতে?"

"সেটা ছোটুর সমস্যা। আমাদের না ভাবলেও চলবে।"

অনুব্রত হাঁ। আর একটা প্রশ্নও কুনকুন করছিল বুকে। রাজা গত তিন বছর পা রাখেনি কলকাতায়। যদি আগামি ডিসেম্বরে হঠাৎ...জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না অনুব্রতর। এই মুহূর্তে করবীর যা ভাবগতিক, হয়তো সটান বলে দেবে, আইরিন আর মিমিকে নিয়ে হোটেলেই নয় থাকবে রাজা। নাঃ, ভিতরে-ভিতরে নির্ঘাত দুই ছেলের উপর চটে আছে করবী। হয়তো নিতান্তই ছেলেমানুষি। তবু তাকে আর না ঘাঁটানোই ভাল।

প্রতিমা জলখাবার এনেছে। দোতলার ডাইনিং টেবিলে রেখে ডাকছে। অনুব্রত গিয়ে চেয়ার টেনে বসল। বাথরুম ঘুরে এসে করবীও। খেতে-খেতেই গিয়ে দু'বার ফোন ধরে এল। অসীম ধৈর্য, একটুও বিরক্তি নেই!

আহার শেষ হতে না-হতে চা-ও হাজির। কাপে চুমুক দিতে-দিতে অনুব্রত প্রতিমাকে বলল, "বাজারের ব্যাগটা দিয়ে গেলি না?"

জিভ কেটে দৌড়েছে প্রতিমা। করবী জিজ্ঞেস করল, "বি ডি মার্কেটে যাচ্ছ নাকি এখন?"

"উপায় কী! তোমার প্রতিমার হুকুম।"

"মার্কেটে একটা ফার্নিচারের দোকান হয়েছে না?"

"কেন?"

"বা রে? মেয়েদের জন্য আলমারি, টেবিল, এসব লাগবে না? ভাবছি, ওদের ঘরে একটা ছোট্ট ফ্রিজও দিয়ে দেব।"

"ওসব কিনবে নাকি এখন?"

"কিছু-কিছু জিনিস তো কিনতে হবেই," করবী পলকা হাসল, "ঘরে টাকা আসবে, না হয় কিছু খরচ হলই।"

অনুব্রতকে কি একেবারেই বুরবক ঠাউরেছে করবী? তার এই পেয়িং গেস্ট বসানোর ব্যাপারটা যে টাকার কারণে নয়, সেই সামান্য সত্যটুকুও কি অনুব্রত

বোঝে না?

কথা না বাড়িয়ে অনুব্রত চা শেষ করল। তারপর পাঞ্জাবি চড়িয়ে, প্রেশারের বড়িটি গিলে, ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়ল। শ্রাবণের আকাশে ভালই মেঘ, কিন্তু বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। সবে সোওয়া ন'টা বাজে, এরই মধ্যে মেঘের আড়াল থেকে বিশ্রী তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। হাওয়াও নেই এতটুকু। চিটপিটে গরমে জ্বালা করছে গা। বাজার হাঁটাপথে প্রায় দশ মিনিট। পৌঁছতে ঘাম ছুটে গেল অনুব্রতর।

ফার্নিচারের দোকানটা বন্ধ। অনুব্রত স্বস্তি পেল যেন। বাজার ঘুরে সারল কেনাকাটা। আমের সময় নেই আর, তবু চেনা ফলওয়ালার ঝুড়িতে সুর্মা ফজলি দেখে একটু-একটু ইচ্ছে হচ্ছে, ভেবেচিন্তে নিয়েই ফেলল দু'খানা। নিল একটা পাকা বেলও। বিকেলে প্রতিমাকে পানা করে দিতে বলবে। পেটটা সব সময়ে পরিষ্কার রাখা দরকার। নইলে বুকের চাপটা বেড়ে যায়। বছরতিনেক আগে একবার হালকা সতর্কবার্তা জানিয়েছে হৃৎপিণ্ড। লিপিড প্রোফাইলও তার খুব একটা ভাল নয়। টুকটাক ওষুধ-বিসুধও চলছে। গ্যাস-ট্যাস হয়ে আবার যাতে না কোনও উৎপাত ঘটে, সেদিকে তো নজর রাখতেই হবে। শরীর বড় বালাই, এই বয়সে কখন পালাই-পালাই ডাক ছাড়বে, তার কোনও স্থিরতা আছে? এই যে ডাক্তারের শাসানিতে ক্লাস টেন থেকে সিগারেট ফোঁকার দীর্ঘ অভ্যেসটিকে সে পরিত্যাগ করেছে, হুইস্কিও আর এক-দু' পেগের বেশি খাচ্ছে না, এতে কি লম্বা হবে আয়ুরেখা? কে জানে!

বাজারের বাইরে আসতেই নির্মল তালুকদারের মুখোমুখি। অনুব্রতদের ব্লকেরই বাসিন্দা। বিকেলের রুটিনমাফিক হাঁটা সেরে ছোট পার্কে গিয়ে বসে অনুব্রত। দু'-পাঁচজনের সঙ্গে একটু গল্পগুজব হয়, সেখানেই আলাপ।

অনুব্রতকে দেখেই উত্তেজিত মুখে এগিয়ে এল নির্মল, "দেখেছেন? খবরটা দেখেছেন?"

অনুব্রত চোখ পিটপিট করল, "কী খবর?"

"সকাল থেকে তো টিভিতে দেখাচ্ছে।"

টিভি চালানোর ফুরসত পেয়েছে কি অনুব্রত? যা ক্রিং-ক্রিংয়ের ধুম।

একটু কৌতূহল নিয়েই অনুব্রত বলল, "হয়েছেটা কী বলবেন তো?"

"ভয়ঙ্কর ডাকাতি। সি ই ব্লকে। বাড়িতে শুধু বুড়োবুড়ি, তাদের মেরেধরে টাকা-পয়সা গয়নাগাটি নিয়ে চম্পট।"

"কেউ বাধা দেয়নি? কাজের লোক ছিল না?"

"বোধ হয় না। তেমন তো কিছু দেখাল না। বুড়োবুড়ি দু'জনেই জোর চোট পেয়েছে। মহিলা তো হসপিটালে।"

"তা তাদের ছেলেমেয়েরা কোথায়?"

"ছেলেমেয়ে আবার কী! একটাই ছেলে। থাকে কানাডায়। পুলিশ তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে। সে আসবে, নাকি ওখানে থেকেই কর্তব্য সারবে, কে জানে। এলেও কম করে তিনদিনের ধাক্কা। এই বিপদের মধ্যে কী অসহায় অবস্থা ভাবুন তো বাপ-মা'র!"

"কাছেপিঠে আত্মীয়স্বজন আছে নিশ্চয়ই। তারা এসে যাবে।"

"তবু...ছেলে যত বল-ভরসা..."

শুনে একটু হাসিই পেল অনুব্রতর। তাদের সল্টলেকে ক'টা বাড়িতে ওই ভরসায় বাস করে বাপ-মা? প্রতিটি পাড়াতেই তো ভূতের বাড়ির মিছিল। কোনওটায় দু'জন বাসিন্দা, কোনওটায় এক। এবাড়ির আওয়াজ ওবাড়িতে পৌঁছয় না। সব বাড়িতে দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা, এমনও তো নয়। সুতরাং এ ধরনের বিপদ-আপদ তো ঘটতেই পারে। যখন তখন।

নির্মল গলা ঝেড়ে বলল, "আমার তো খবরটা দেখা ইস্তক নার্ভাস লাগছে। আমরাও তো বুড়োবুড়িই শুধু থাকি। রাতদিন থাকার মতো একটা বিশ্বাসী কাজের লোক পর্যন্ত পেলাম না। তার উপর আমার গিন্নিটি তো প্রায় অচল। বাতের ব্যথায় কোঁকাচ্ছে সারাক্ষণ!"

নির্মলের একটু বেশি-বেশি কাঁদুনি গাওয়ার অভ্যেস আছে, জানে অনুব্রত। তাদের আড্ডায় এই নিয়ে মাঝে-মাঝে হাসিঠাট্টাও হয়। নির্মলের স্ত্রীর অসুখ-বিসুখ থাকতেই পারে। হয়তো করবীর মতো সে অত ফিট নয়, তবে পঙ্গুও নয়। দিব্যি হেঁটেচলে বেড়ায় মহিলা। বাজারেই তো কত বার দেখা হয়েছে অনুব্রতর সঙ্গে।

তা ওসব কথা কি বলা যায়? অনুব্রত আলগা উপদেশ ঝাড়ল, "আমার মতো একতলাটা ভাড়া দিয়ে দিন। খানিকটা প্রোটেকশন তো থাকবে।"

"অসম্ভব! কত সাধ করে বাড়িটা বানিয়েছিলাম। সেখানে অজানা, অচেনা লোক এসে বাস করবে? আমারই চোখের সামনে? তার চেয়ে বরং বাড়ি বেচে দিয়ে ছেলের কাছে চলে যাব, সেও ভি আচ্ছা।"

কী অসহ্য ভাবনা! ছেলেদের সংসারে গিয়ে বডি ফেলবে, এ তো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না অনুব্রত। দু'-তিন সপ্তাহ তাদের মাঝে কাটিয়ে এল, কিংবা তারা এসে মাঝে-মাঝে মুখ দেখিয়ে গেল, সকলকে নিয়ে ক'টা দিন হইচই, ব্যস! তাদের সঙ্গে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের নৈকট্য অনুব্রতর আর সইবে কি?

অনুব্রত হালকা ভাবেই বলল, "অত ড্রাস্টিক স্টেপ নেবেন না। তার চেয়ে বাড়িতে একটা-দুটো পেয়িং গেস্ট রাখুন। দু'-চারটে পয়সাও আসবে, পাহারাদারিও হবে।"

"খেপেছেন? কোথাকার কোন চোর-চোট্টা-চিটিংবাজ ঢুকে পড়বে। পরে হয়তো পুলিশের হাত বাম্বু খাব!"

"আহা, ছেলে কেন? ফিমেলও তো রাখা যায়। ছাত্রী-টাত্রী। কিংবা ওয়ার্কিং গার্লস...যারা হয়তো কলসেন্টার-ফেন্টারে চাকরি করে..."

"না, না। মেয়ে মানে তো আর এক ধরনের বিপদ। কার সঙ্গে কোথায় লটঘট করবে, কী বাধাবে...হয়তো সুইসাইড-মুইসাইডই করে বসল! তখন তো হাতে দড়ি পড়ে যাবে মশাই...বরং ছেলে তো ডাকছে, তার কাছেই..."

মৃদু হেসে সরে এল অনুব্রত। ফিরছে। শ্রাবণের গুমোট আকাশ মাথায় নিয়ে। মেয়ে-পেয়িংগেস্ট নিয়ে যে-আশঙ্কাটার কথা বলল নির্মল, তা কি একেবারেই ফেলে দেওয়ার মতো? কয়েক সপ্তাহ আগে এরকম একটা খবরও পড়েছিল না? গিয়ে বলবে করবীকে? বোঝাবে?

উঁহু, লাভ নেই, লাভ নেই। যা জিদ্দি মেয়েমানুষ!

ব্যাকপ্যাকে টুকিটাকি জিনিসপত্র ভরছিল রূপসা। টুথব্রাশ, পেস্ট, শ্যাম্পু কন্ডিশনার, চিরুনি, ক্লিপসহ অজস্র হাবিজাবি। সকালে কাচা প্যান্টি ব্রা শুকিয়ে গেছে, ঢুকিয়ে নিল তোয়ালের সঙ্গে। ঘরের চারদিকে চারখানা তক্তপোষ, ঝুঁকে নিজের শয্যার তলাটা একবার দেখে নিল আর কিছু পড়ে আছে কিনা। হ্যাঁ, রয়েছে বই কী। আগের পিঠখোলা ব্যাগখানাই তো দিব্যি গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাঁধের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে বাতিল করেছিল। তা ছাড়া ওটা বেশ ছোট। তা হোক, ফেলে যাবে কেন, বাড়তি একটা সঙ্গে থাকা ভাল। কখন কী কাজে লাগে। শুধু একটু সেলাই করে নিতে হবে, এই যা।

ব্যাগখানা ধুলোয় মাখামাখি। বের করে এনে রূপসা ঝাড়ল একটু। বড্ড নোংরা, যাচ্ছে না। প্রথম মাসের স্টাইপেন্ড পেয়ে পছন্দ করে কিনেছিল, অনাদরে এখন কী মলিন দশা। এই অবস্থায় তো ব্যাকপ্যাকে ঢোকানোও যাবে না। আবার আলাদা করে বয়ে নিয়ে যাওয়াটাও যথেষ্ট দৃষ্টিকটু। নতুন ডেরায় যাচ্ছে রূপসা, ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাকে দেখে বেশ পরিচ্ছন্ন গোছেরই মনে হয়। তাঁদের টিপটপ বাড়িতে এই হতশ্রী ব্যাগ নিয়ে ঢুকলে। অবশ্য কে কী ভাবল, তাতে রূপসার কিছু যায় আসে না। দস্তুরমতো পয়সা দিয়েই তো থাকবে সে। নয় কি? তবু...মনটা খুঁত-খুঁত করছিল রূপসার। কী করা যায়, কী করা যায়? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ট্রলিব্যাগে তুলো আছে অনেক। ঝটিতি উঠে গিয়ে দাঁড় করানো ট্রলিব্যাগের চেন খুলে বের করল প্যাকেট। এক খাবলা ছিঁড়ে বাথরুম থেকে ভিজিয়ে আনল। তারপর চিপে-চিপে মুছল ব্যাগখানা। ব্যস, সমস্যার অবসান। দু' মিনিটেই ব্যাগ ঝকঝকে। এবার তো বেরিয়ে পড়লেই হয়। রূপসা জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল। ইব্রাহিমপুর রোডের এই বাড়িটার একতলা থেকে কিছুই প্রায় দেখা যায় না। যেটুকু মালুম হচ্ছে, রোদ এখনও বেশ চড়া। সবে তো বিকেল চারটে, আর একটু বসে যাবে? এসময়টায় যাদবপুরের মুখে ট্যাক্সি পাওয়া যায়, এরপর হয়তো...

সামান্য দোনামোনার মাঝেই হুড়মুড়িয়ে দরজা খুলে এণাক্ষীর প্রবেশ। পিঠে যথারীতি ঝোলা। পরনে জিন্‌স, টি-শার্ট। চুল স্টেপকাট। ঝটিতি ঘরে চোখ বুলিয়ে এণাক্ষী বলল, "ওমা, তুই তৈরি হয়ে গেছিস? এখনই চলে যাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ রে," শ্যামলা রং রূপসার লাবণ্যমাখা মুখে আলতো হাসি, "বন্দরের কাল হল শেষ। এবার এখান থেকে নোঙর তোলার পালা।"

এণাক্ষী আহ্লাদী সুরে বলল, "কেন চলে যাচ্ছিস রে? তোতে-আমাতে কী চমৎকার পটে গিয়েছিল!"

কথাটা একেবারে ভুল নয়। তেমন একটা গভীর হৃদ্যতা না থাকলেও, এণাক্ষীর সঙ্গে রূপসার খানিকটা বন্ধুত্ব তো হয়েছেই। অন্তত ঘরের বাকি দুই বোর্ডারের তুলনায় বেশি তো বটেই। তারা দু'জনই নাগাল্যান্ডের মেয়ে। চাকরি করে একই কলসেন্টারে। অফিস ছাড়া বাকি সময়টা কোথায়-কোথায় চরে বেড়ায়, কে জানে! তাদের তো দেখা মেলাই ভার। যদি বা থাকে, নিজেদের মধ্যে কী দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে, হি-হি হা-হা হাসে, নয়তো বিভোর থাকে ফেসবুকে। নিয়মরক্ষের 'হাই হ্যালো'র বাইরে তাদের সঙ্গে তো

সম্পর্কই নেই রূপসা-এণাক্ষীর। শিলিগুড়ির মেয়ে এণাক্ষী। বাবা সিভিল কন্ট্রাক্টর। সে কলকাতায় এসেছে এয়ার হোস্টেস হওয়ার এক ইনস্টিটিউটে ট্রেনিং নিতে। রূপসার মতো দেশ-কাল-সমাজ নিয়ে সে মোটেই ভাবিত নয়। তবু হাসিখুশি এই অগভীর মেয়েটিকে রূপসার মন্দ লাগে না।

রূপসা হেসে বলল, "ওই নিয়ে ভাবিস না। আমার জায়গায় আর একজন তো আসবে, তার সঙ্গেও তোর জমে যাবে।"

"কী জানি! আর একটা নাগা মেয়ে ঢুকে পড়লেই তো আমি গন! কথা বলার লোকই থাকবে না।"

আশঙ্কাটা অবশ্য উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের বহু পাহাড়ি মেয়ে এখন চাকরি করতে আসছে কলকাতায়। সহজে বাড়ি ভাড়া পায় না বলে এই ধরনের মেসবাড়িতে তাদের বেশি ভিড়। এণাক্ষীর কপাল খারাপ হলে তেমন রুমমেট মিলতেও পারে।

ব্যাগ টেবিলে রেখে বিছানায় বসেছে এণাক্ষী। দুঃখী-দুঃখী মুখে বলল, "তোর কিন্তু এককথায় উঠে যেতে রাজি হওয়াটা উচিত হয়নি।"

"তুই এটাকে এককথা বলিস? রোজ বাড়িওয়ালার ছেলেটা এসে চোখ পাকাচ্ছে...দেখলি তো, সেদিন পাড়ার ছেলেদের ডেকে এনে কেমন হল্লা করে গেল..."

"পাত্তা না দিলেই হত। তুই তো চুরি-ডাকাতি, খুনখারাপি কিছু করিসনি!"

"চোর-ডাকাত হলে কি অশান্তি হত? বরং বুক ফুলিয়ে থাকতাম।" রূপসা ব্যঙ্গের সুরে বলল, "কিন্তু আমরা যে চোরডাকাতের চেয়েও খারাপ। একটু অন্য গোত্রের ভাবনাচিন্তা করি যে! অন্যায়, অবিচারগুলো মুখ বুজে মেনে নিতে পারি না। এ কি কম বড় অপরাধ?"

"তোর আবার বেশি-বেশি। এসব ঝুটঝামেলায় থাকার তোর দরকারটা কী? রিসার্চ না কী যেন করছিস, তাই নিয়েই থাক না। ডক্টরেট যদি করে নিতে পারিস, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে প্রোফেসারি পেয়েই যাবি। তখন তুই যা খুশি কর না, কে তোকে আটকাবে?"

রূপসার হাসি পেয়ে গেল। একদম অশিক্ষিতের মতো কথাবার্তা। কে বলবে, এই মেয়ে বি এ পাশ করেছে! নেট পরীক্ষা দিয়ে এই জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপটা পাওয়ার আগে বছরখানেক একটা কলেজে অতিথি অধ্যাপকের চাকরি করেছিল রূপসা। তখনই সে দেখেছে, বেশিরভাগ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান প্রায় এই গোছেরই। ধ্যানধারণাতেও তাদের সঙ্গে খুব একটা ইতরবিশেষ নেই এণাক্ষীর।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে রূপসা বলল, "মনের মতো সঙ্গীসাথী না পেলে তুইও এখান থেকে বেরিয়ে যাস।"

"তাই হয়তো করতে হবে। তবে আমার ইনস্টিটিউট তো গড়িয়াহাটে, যাদবপুর থেকে যাতায়াতটা খুব সহজ," আবার রূপসার জন্য শোক উথলে উঠল এণাক্ষীর, "তোরও এখান থেকে কত সুবিধে ছিল বল তো? জাস্ট কয়েক পা গেলে ইউনিভার্সিটি। যতবার খুশি যেতে পারিস, যতক্ষণ খুশি লাইব্রেরিতে থাকতে পারিস...দুম করে একদম সেই সল্টলেক চলে গেলি? যাতায়াতেই তো তোর কত টাইম খেয়ে যাবে!"

"কী আর করা!" রূপসা কাঁধ ঝাঁকাল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে যে খানিকটা তফাতেই সরে যেতে চায়, সেটা ভাঙল না। মুখে সামান্য হতাশার ভাব ফুটিয়ে বলল, "কাছেপিঠে সেরকম ভাল তো কিছু পেলাম না।"

"ওখানে খুব হাই-ফাই ব্যাপার, তাই না?"

"তেমন একটা কিছু নয়। ঘরটা বড়, এয়ারি। থাকব মাত্র দু'জন। পরিবেশটাও বেশ খোলামেলা। আশা করছি, খাওয়াদাওয়াও এবাড়ির মতো মেসর্মাকা হবে না।"

"লাঞ্চ, ডিনার, সব দেবে?"

"না, না, তোকে তো বললাম। শুধু ব্রেকফাস্ট আর রাতের খাওয়া।"

"চার্জ তা হলে ভালই নিচ্ছে, কী বল?"

"এখানেই বা কম কী রে? রোজ-রোজ কাটাপোনার ঝোল, নয়তো ডিমের ডালনা। তাতেই তো গলা মুচড়ে চার হাজার! তা ছাড়া রবিবার আর ছুটির দিনে দুপুরের খাওয়াটাও দেবে। এখানে সেটা আলাদা বিল করে।"

এণাক্ষী ফের কী একটা যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, অমনই মোবাইল বেজে উঠেছে রূপসার। মনিটরে চোখ পড়তেই মৃদু বিস্ময়। করবী মৈত্র! অর্থাৎ তার ভাবী গৃহস্বামিনী।

গলা ঝেড়ে রূপসা বলল, "হ্যাঁ মাসিমা, বলুন?"

"তুমি তো আজই বিকেলে আসবে বলেছিলে। তাই না?"

"হ্যাঁ। এই তো এখনই বেরচ্ছি।"

"ও! ভাবলাম, কোনও কারণে যদি তোমার প্ল্যান চেঞ্জ হয়ে থাকে..." একটু থেমে থাকল মহিলা। ফের স্বর ফুটেছে, "এসো। অপেক্ষা করছি।"

ভদ্রমহিলার গলায় ঘরোয়া আন্তরিকতার ছোঁওয়া। ভাল লাগল রূপসার। সঙ্গে-সঙ্গে এ-ও মনে হল, ওই বয়সের মহিলারা বড্ড বেশি গার্জেনগিরি ফলায়। করবী মৈত্রও কি সেরকম? না হলেই মঙ্গল! পেয়িং গেস্ট আর মালকিনের সম্পর্ক যত দূর সম্ভব পেশাদার থাকাই তো শ্রেয়।

ফোনটা রেখে রূপসা এণাক্ষীকে বলল, "এবার তো উঠতে হয় রে। ও বাড়ি থেকে কল এসে গেছে।"

"তাড়া লাগাচ্ছে বুঝি?"

"ওরকমই। বয়স্ক মানুষ তো, বোধ হয় চায়, দিন থাকতে-থাকতেই যাই।"

কিছুটা ছলছল চোখে বিছানা থেকে উঠে এল এণাক্ষী। আলগা জড়িয়ে ধরল রূপসাকে। গালে গাল রাখল। বলল, "ভুলে যাস না কিন্তু। কনট্যাক্ট রাখিস।"

"ফেসবুক তো রইলই। ওখানেই মোলাকাত হবে।"

"ইস, তুই তো ফেসবুক খুলিসই না।"

"এবার থেকে নয় খুলব। শুধু তোর জন্য!" রূপসা নরম করে হাসল। কয়েক বছরের ছোট এণাক্ষীর জন্য তার যেন খানিকটা মায়াই জাগছে। এই শহরের সঙ্গে দারুণ ভাবে মিশে গেছে এণাক্ষী। একা-একাই শপিং মল চষে বেড়ায়! ছলাকলা, ভাবভঙ্গিও শিখেছে অনেক। তবু সারল্যটুকু যেন ঘোচেনি পুরোপুরি। গলায় একটা দিদিসুলভ সুর এনে রূপসা বলল, "তোর বিমানসেবিকা হওয়ার স্বপ্ন সফল হোক। আশা করি, কোর্সটা শেষ হলেই আকাশে-আকাশে ঘুরে বেড়াতে পারবি। উড়ন্ত প্লেন দেখলেই মনে হবে তুই হয়তো তাতে আছিস।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ!" এণাক্ষীর চোখজোড়া উজ্জ্বল হল, "তুইও নির্বিঘ্নে থাক। শান্তিতে কাজ শেষ কর।"

এণাক্ষীর কাঁধে আলগা চাপ দিয়ে রূপসা সরে এল। এবার দায়মুক্ত হওয়ার পালা। ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলায় ওঠার দরজা বসানো সিঁড়িটায় এল। বেল বাজাচ্ছে।

উফ, ফাটা কপাল। বাড়িওয়ালার ছোট ছেলেটাই নেমেছে। কাছেই নর্থ রোডে একটা সাইবার কাফে চালায়। রাজনৈতিক প্রতিপত্তির জোরে এপাড়ার এক হেক্কড়ও বটে। সুবীর না প্রবীর, কী একটা নাম থাকলেও 'নান্টু' বলেই চেনে সবাই। দুপুরে বোধ হয় বাড়িতে খেতে এসেছিল নান্টুবাবু, এখনও বেরয়নি।

ঈষৎ ঢুলুঢুলু চোখে নান্টু জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"আজ চলে যাচ্ছি," দরজার চাবিটা বাড়িয়ে দিল রূপসা, "এটা রাখুন।"

"আপনার পেমেন্ট তো সব ক্লিয়ার আছে, তাই না?"

"আগামই তো নিয়ে নেন। নয় কি?"

"সোজা কথার সোজা উত্তর দিতে পারেন না?" নান্টু সামান্য ঝেঁঝে উঠল, "তা যাচ্ছেনটা কোথায়?"

"আপনাকে তো সেটা জানাতে বাধ্য নই।"

নান্টু বাঁকা সুরে বলল, "আত্মগোপন করছেন নাকি?"

"আপনাদের যা নেটওয়ার্ক, সে উপায় কি আছে?"

"এই কথাটাই মাথায় রাখবেন। আশা করব, আপনাদের ওই অশান্তি বাধানোর খেলাগুলো এবার বন্ধ হবে। নতুন করে ঝামেলা পাকালে আপনার গারদবাস কিন্তু অনিবার্য!"

চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠল রূপসার মাথাটা! দু'-একটা কড়া কথা শুনিয়ে দিতে যাচ্ছিল, অতি কষ্টে দমন করল নিজেকে। পার্টির বলে বলীয়ান, নিজেকে সর্বশক্তিমান ভাবা এসব প্রাণীগুলোর সঙ্গে এখন বিবাদ বাধানো নেহাতই অর্থহীন। বড্ড ক্ষতিকর টাইপ। হয়তো তার যাওয়াটাই কেঁচিয়ে দেবে।

রূপসা বিরস মুখে বলল, "উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। চলি।"

"আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই। ইউনিভার্সিটি ছেড়ে তো পালাচ্ছেন না।"

জবাব দেওয়ার আর প্রয়োজন বোধ করল না রূপসা। সোজা ঘরে ফিরে ব্যাকপ্যাকটি তুলে নিল পিঠে। কাঁধে ব্যাগসমেত ল্যাপটপ। দু' হাতে দু' খানা ট্রলি সুটকেসের হাতল ধরে এণাক্ষীকে বলল, "আসি রে।"

শুয়ে পড়েছিল এণাক্ষী। উঠে বসেছে, "আমি একটু হেল্প করে দেব?"

"কিচ্ছু দরকার নেই। সারাদিন ক্লাস করে এসেছিস, রেস্ট নে...বাই।"

"বাই। গুড লাক। অল দ্য বেস্ট।"

বাড়ির বাইরে এসে রূপসা একটু অস্বস্তি বোধ করল। গলি থেকে মেন রোড হাতপঞ্চাশেক। রাস্তা দিয়ে সুটকেসদুটো টানতে-টানতে নিয়ে যেতে হবে। কাজটা খুবই সামান্য। কিন্তু কিছু দোকানপাট খোলা আছে যে! তাকে নিয়ে খুচরো ঝামেলাটা এখানকার অনেকেই দেখেছে, তার এই নিষ্ক্রমণটাও হয়তো প্যাট-প্যাট করে গিলবে এবং রূপসা নির্ঘাত মুখরোচক চাটনি হবে সন্ধেবেলা! এণাক্ষী সঙ্গে থাকলে হয়তো কেউ অত নজর করত না।

ধুস, রূপসা কি চোর-বদমাইশ নাকি? লুকিয়ে পালাচ্ছে? অস্বস্তিভাবটা

মগজ থেকে ঝেড়ে ফেলল রূপসা। চারপাশকে উপেক্ষা করেই হাঁটছে গটগটিয়ে। বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াতেও হল না, ট্যাক্সি মজুত। সুটকেস দু'খানা ডিকিতে চালান করে সিটে হেলান দিল রূপসা। চলেছে নতুন ঠিকানায়।

কাল-পরশু পর পর দু'দিন বৃষ্টি হয়েছিল শহরে। আজকের কড়া রোদ্দুরেও পথঘাটের জল পুরো উবে যায়নি, জমে আছে খানাখন্দে। বাতাস রীতিমতো আর্দ্র। হাওয়ার ঝাপটাতেও একটা ঘামে থমথম ভাব যাচ্ছে না কিছুতেই। ট্যাক্সি থেকে থেকে থামছে সিগনালে, অমনই ভিজে যাচ্ছে ঘাড়-গলা।

রূপসা তাকিয়ে ছিল বাইরে। কিছুই দেখছে না সেভাবে। নতুন গজিয়ে ওঠা ফ্ল্যাট, ছোট-বড় আবাসন হু হু পেরিয়ে যাচ্ছে শুধু। হঠাৎ আবছাভাবে মনে হল, এবার থেকে সে স্যারের বাড়ির কাছাকাছি থাকবে। সল্টলেকে সেক্টার ওয়ান থেকে সেক্টার থ্রি কতটুকুই বা দূর! তবে তাতে লাভটাই বা কী? সে তার রিসার্চ গাইডের বাড়িতে যায় ক'বার? গত উনিশ মাসে সাকুল্যে মাত্র দু'দিন তো গেছে। তাও প্রফেসার প্রতিম গুপ্ত তখন কী এক পারিবারিক কারণে টানা ছুটি নিয়েছিলেন এবং তখনই রূপসার জরুরি আলোচনার প্রয়োজন পড়েছিল। তাই বাধ্য হয়েই...স্যারও অবশ্য পছন্দ করেন না তাঁর রিসার্চ স্কলাররা বাড়ি এসে ভিড় করুক। মুখের উপরেই বলেন, 'ইউনিভার্সিটির কাজ ইউনিভার্সিটিতেই সারো।'

তবে সারা আর হচ্ছে কোথায় রূপসার? বড্ড ঢিমেতালে এগোচ্ছে কাজকর্ম। কেন যে মনই বসছে না! টপিকটা রূপসার তত পছন্দ নয় বলে? কিন্তু বিষয়টা খারাপ কী? সিপাই বিদ্রোহ এবং তৎকালীন সংবাদপত্র। এ নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনার অবকাশ তো আছেই। বিশেষত ওই সময়ে ইউরোপের কাগজগুলো বিদ্রোহটাকে কী চোখে দেখেছিল, তা নিয়ে খুব একটা কাটাছেঁড়া তো হয়নি। স্যার যদিও ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোকেই ফের ঘাঁটাঘাঁটি করতে বলছেন...মোবাইল বাজছে। আবার কি করবী মৈত্র? মুঠোয় ধরা যন্ত্রটা চোখের সামনে আনল রূপসা। উঁহু, মনিটরে স্মাইলি, অর্থাৎ বিতান।

রূপসা মোবাইল ফোন কানে চাপল, "তুই এখন? আজ তোদের রিহার্সাল নেই? মানে ড্রাম পেটানো?"

"ফাউল টক করিস না," ওপারে বিতানের মজারু গলা, "গানকে আজ ছুটি দিয়েছি।"

"গানের বাপের ভাগ্যি!" রূপসার গলাও তরল, "আমি তো আজ চললাম রে।"

"সেই জন্যই তো ফোন করা। কখন যাচ্ছিস?"

"আমি তো অলরেডি পথে। ট্যাক্সিতে।"

"যাঃ, আমি ভাবলাম তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব!"

"সরি, যাঁদের আশ্রয়ে যাচ্ছি, তাঁরা খুবই কড়া!" ছোট্ট করে গুল ঝেড়ে দিল রূপসা, "ওঁরা বয়ফ্রেন্ড অ্যালাও করবেন না। তোর মতো পনিটেল ছাগলদাড়িকে তো গেটই পেরতে দেবেন না।"

"বাড়িওয়ালা বুঝি বুড়ঢা?"

করবী মৈত্র কিংবা তাঁর বরটিকে কি ওই বিশেষণে অভিহিত করা যায়? দু'জনেরই বয়স হয়েছে। তবে টিপিকাল খিটখিটে, হেঁপোকেশো ধরনের তো নয়।

রূপসা লঘু স্বরে বলল, "আজ্ঞে না। ভদ্রলোক এখনও রীতিমতো হ্যান্ডসাম। ভদ্রমহিলাকেও সুন্দরী বলা যায়। দু'জনেই বেশ স্মার্ট।"

"তা হলে এরকম আদ্যিকালের মেন্টালিটি কেন, অ্যাঁ? একটা প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের কাছে একটা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে আসবে কি আসবে না, ঠিক করার তাঁরা কে?"

"বাড়িটা তাঁদের। সেখানে কাকে এনট্রি দেবেন, কাকে দেবেন না, সেটা তাঁরাই স্থির করবেন। সমাজে তো এই নিয়মটাই চালু।"

"ভেরি ব্যাড। আশা করি, তোরা রাষ্ট্রক্ষমতার দখল নিতে পারলে এই সব নিয়মফিয়মগুলো উঠে যাবে।"

"অ্যাই, কতবার না বলেছি, সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাইয়ার্কি আমি ডাইজেস্ট করতে পারি না!"

"সে কি আমিও পারি? জেনেশুনেও তুই তা হলে আমার গান তুলে আওয়াজ মারলি কেন?"

"হুঁঃ, গান না আরও কিছু! সুরের বালাই নেই, কথার ছিরিছাঁদ নেই... বাজনা বাজিয়ে খবরের কাগজে পড়লেও ওই একই রকম শোনাবে, বুঝলি?"

"আমার কিন্তু কান গরম হয়ে যাচ্ছে! এবার ফোন রেখে দেব!"

"দে না, কে বারণ করেছে?"

"ও, কায়দা করে আমাকে কাটানোর ধান্দা? সরি, ওটি হচ্ছে না। আমি তোকে এখন বোর করবই।"

রূপসা হেসে ফেলল। এই সরস ভাবটা আছে বলেই না বিতানের সঙ্গে কথা বলতে এত ভাল লাগে। যেন এক ঝলক টাটকা বাতাস বইয়ে দেয় প্রাণে। হাসতে-হাসতেই রূপসা জিজ্ঞেস করল, "তা নতুন গান-টান কিছু বাঁধলি?"

"মনে-মনে পেন ঘাষাঘষি চলছে। এখনও বেরোয়নি... এটা কেমন হবে রে? জীবন যখন শুকনো মরুভূমি/ তুই যে তখন খেজুরগাছের ছায়া/ জীবন যখন রোদে পোড়া দুপুর/ তুই কি তখন মাটির ভিজে দাওয়া..."

"লা জবাব!" বলেই কুলকুলিয়ে হেসে উঠল রূপসা, "খেজুরগাছের ছায়া পড়ে তো রে? আমি কিন্তু দেখিনি। আর মাটির দাওয়া ভিজে গেলে বড্ড কাদা কাদা হয়ে যায়!"

"ওফ, হরিব্‌ল। তোর মধ্যে কি একটুও রোম্যান্স নেই? লাইনগুলোর ইনার মিনিং তুই দেখলি না?"

"দেখার বাসনাও নেই রে!"

"বুঝলাম," একটু যেন মিইয়ে গেছে বিতানের গলা। একটু সময় নিয়ে বলল, "কবে আমাদের দেখা হচ্ছে?"

"বলতে পারছি না রে। কাল-পরশু ইউনিভার্সিটি ছুটি, দু'দিন ও পথ মাড়াচ্ছি না। সেই সোমবার যদি যাই..."

"একটা শুধু বার্তা দিও বস। দেখবে, বান্দা হাজির। তোকে না দেখে বেশিদিন থাকা যায়, তুই বল?"

"ওফ, আবার সেই ন্যাকা-ন্যাকা কথা! ছাড়ছি, কেমন?"

ফোন তালুবন্দি করে রূপসা ঈষৎ বিমনা যেন। তার সঙ্গে তো কোনও ব্যাপারেই মিল নেই বিতানের। না চিন্তাভাবনায়, না জীবনযাপনের ধারায়। কী করে যে বিতানের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল? বন্ধুত্ব? নাকি তার চেয়ে বেশি কিছু? উঁহু, বিতান যাই ভাবুক না কেন, রূপসার কাছে ওটা বন্ধুত্বই। রূপসার পক্ষে এর বেশি ভাবা সম্ভবই নয়। তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে যাদবপুর থেকেই পাশ করেছিল বিতান। চাকরিতে ঢুকেও ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে গান-গান করেই পাগল। একটা ব্যান্ডও বানিয়েছে বিতানরা, গান খ্যাপা! কয়েকটা গান জনপ্রিয় হয়েছে মোটামুটি, কল-শোও পায় কিছু-কিছু। রোজগার যেমনই হোক, বিতান জীবন কাটায় উচ্চণ্ডের মতো। যখন-তখন নেশা করছে, এর ওর তার সঙ্গে অহরহ ঝামেলা বাধাচ্ছে, হুটহাট কোথায় যে কখন চলে যায় তার ঠিক নেই! খুব যে রইস বাড়ির ছেলে, তা-ও তো নয়। বাবা-মা দু'জনেই সরকারি চাকরি করে। এখন তারাও তো বুঝি রিটায়ারমেন্টের মুখে-মুখে। ছেলের হাল দেখে বোধ হয় দু'জনেই বেহাল। রূপসার বহরমপুরের বাড়িতে ভালই চর্চা আছে গানবাজনার। তার বাবা তো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দারুণ সমঝদার। সেই সুবাদে রূপসার কান এই ব্যান্ড মিউজিক মোটেও নিতে পারে না। বিতানের নেশাড়ু লক্ষ্যহীন জীবনও তার বিলকুল না-পসন্দ। তবু যে কোন আজব রসায়নে তাদের বন্ধুত্বটা গড়ে উঠল! বিতানের নেই-আঁকড়া স্বভাবের জন্য কী? উঁহু, নিশ্চয়ই প্রশ্রয় পেয়েছে বিতান, নইলে কি সে...

ট্যাক্সি ঢুকছে সল্টলেকে। রূপসা টান-টান হল। এই অঞ্চলটা সে মোটেই ভাল চেনে না। এখানকার রাস্তাঘাট বাড়িঘরগুলো কেমন একই রকম লাগে। একটু অন্যমনস্ক হলেই গন্তব্যটা না পেরিয়ে যায়!

নাঃ, ঠিক জায়গাতেই থেমেছে। ট্যাক্সি থেকে নামতেই রূপসার নজর পড়ল দোলতলার ব্যালকনিতে। করবী দাঁড়িয়ে। রূপসার প্রতীক্ষাতেই কি?

মালপত্র টেনে-টেনে উপরে তুলল রূপসা। একটা সুটকেসে বোঝাই শুধু বই। ওটা তুলতেই গলদঘর্ম দশা। হাঁপাচ্ছে অল্প-অল্প। তবু হেসে করবীকে বলল, "পৌঁছে গেছি। মাত্র একটা দিনই তো সন্ধেবেলা এসেছিলাম, তাও একবারে চিনতে পেরেছি।"

করবীর ঠোঁটে পাতলা হাসি, "কথা পরে বলো, আগে একটু জিরিয়ে নাও। জল খাবে?"

রূপসা ঘাড় নাড়ল, "হলে ভাল হয়।"

"ঠান্ডা? নাকি মিশিয়ে?"

"এমনি জলও খেতে পারি।"

"তুমি এই বাইরের ঘরের সোফায় বোসো। আমি আনছি।"

উল্টো দিকের সোফায় গৃহকর্তা আসীন। বেশভূষা দেখে মনে হয়, এখনই বেরবে কোথাও। রূপসার পানে চেয়ে ঠোঁট অল্প ফাঁক হল অনুব্রতর। প্রত্যুত্তর রূপসারও। বিনয়ী স্বরে বলল, "ভাল আছেন মেসোমশাই?"

"ওঃ, শিওর। আই অ্যাম অলওয়েজ ফাইন!" অনুব্রতর তুরন্ত জবাব। করবী জল নিয়ে ঢুকেছে ঘরে, তাকে বলল, "প্রতিমাকে ডাকো। মালগুলো ঘরে নিয়ে যেতে একটু হাতে-হাতে সাহায্য করুক।"

"দরকার নেই," রূপসা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি একাই পারব।"

করবী বলল, "তোমার রুমমেট কিন্তু আগেই এসে গেছে।"

"ও," গলায় সামান্য কৌতূহল ফোটাল রূপসা, "কখন?"

"আজ সকালে। ওর বাবা এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

রূপসার সঙ্গেও কি বাবা-কাকা গোছের কারওকে আশা করেছিলেন মহিলা? রূপসা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "আমি

কিন্তু কাউকে ডাকিনি। সেই বহরমপুর থেকে আসা...”

“তাতে কী আছে? যে যেটা সুবিধে মনে করে,” করবীর ঠোঁটে ফের পাতলা হাসি, “তুমি কি সালোয়ার কামিজই পরো?”

“আমাকে ইউনিভার্সিটিতে মাঝে-মাঝে ক্লাস নিতে হয় তো, তাই শাড়িও পরি। তবে সালোয়ারই বেশি...”

“তোমাদের বয়সি মেয়েকে কিন্তু জিন্‌সেও বেশ লাগে। তবে তুমি তো হাফ ছাত্রী, হাফ দিদিমণি!” হাসিটি সামান্য প্রসারিত হল করবীর, “তোমার সঙ্গিনীটি কিন্তু পুরোই ছাত্রী। তোমার চেয়ে অনেকটা ছোট। একটু মানিয়ে গুছিয়ে নিও।”

“নিশ্চয়ই মাসিমা। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না।”

আরও দুটো-চারটে কথা বলে নির্ধারিত ঘরে এল রূপসা। একাই। লটবহরসমেত। ঢুকে একটু অবাকই হল। মেয়েটি তার প্রবেশ খেয়ালই করেনি, দাঁড়িয়ে আছে জানলায়। মনখারাপ? ভাবছে কিছু? নাকি পড়ন্ত বিকেলের শোভায় বিভোর?

রূপসা ডাকল, “হাই!”

মেয়েটি ঘুরে তাকিয়েছে। ওমা, এ তো একদমই কচি! গা থেকে স্কুলের গন্ধ গেছে কিনাও সন্দেহ। পরিচয় হতেই অবশ্য ভুল ভাঙল। সম্পূর্ণা নামের মেয়েটি কেমিস্ট্রি নিয়ে এম এসসি-তে ভর্তি হয়েছে। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে পড়ে। বাড়ি বর্ধমানে, গুসকরার কাছে এক গ্রামে। কলকাতায় শ্যামবাজারের এক লেডিজ হস্টেলে উঠেছিল, লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হচ্ছে বলে চলে এসেছে এখানে। কথাবার্তায় মেয়েটি বেশ আড়ষ্ট। খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে সব জানতে হল। রূপসা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছে শুনে কী সমীহ তার!

আলাপচারিতার মাঝেই হঠাৎ রূপসার ফোন। বহরমপুর থেকে। মা। রূপসা বলল, “বলো...”

“তুই নতুন জায়গায় চলে গেছিস?”

“এই তো এলাম।”

“ওখানে এবার একটু থিতু থেকো। গন্ডগোল বাধিও না।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডোন্ট ওয়ারি।”

“দুশ্চিন্তা তো আমাদের করতেই হবে। তোমার বাবা তো রোজ বলছে, মেয়েটাকে কলকাতায় যেতে দেওয়াটা ভুল হয়ে গেছে।”

“আঃ, মা!”

“আমাকে চুপ করাচ্ছিস কেন? অন্য সব সঙ্গ এবার ছাড়। মন দিয়ে নিজের কাজটা কর। পাঁচজনের কথায় মেতে নিজের পায়ে কুড়ুলটি আর মেরো না...”

সম্পূর্ণা এদিকেই তাকিয়ে। অস্বস্তি হচ্ছিল রূপসার। ভাগ্যিস মা'র কথা শুনতে পাচ্ছে না মেয়েটা!

বৃষ্টি পড়ছিল ঝিরঝির। সকাল থেকে চলছে। একটানা নয় অবশ্য, থামছে মাঝে-মাঝে। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার শুরু হচ্ছে বারিধারা। শ্রাবণের শেষ দিকে আকাশ একেবারে খটখটে শুকনো হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, এ বছরের মতো ক্ষান্ত হলেন বরুণদেব। উঁহু, ভাদ্রের গোড়ায় আবার তিনি মেঘবাহিনী নিয়ে হাজির! অল্পবিস্তর ঢালছেনও রোজ। গরম কিন্তু মোটেই কমেনি, উল্টে বাতাসের প্যাচপেচে ভাব যেন আরও বাড়ছে প্রতিদিন।

ছাড়া-ছাড়া বৃষ্টিটাকে দেখছিল করবী। ঘ্রাণ নিচ্ছিল ভিজে-ভিজে হাওয়ার। ব্যালকনি থেকে। বেতের চেয়ারে বসে। সকালে যাও বা অল্পস্বল্প ঘরোয়া কাজকর্ম থাকে, দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর এই সময়টায় তো কিছুই করার নেই। হয় টিভি খুলে বসো, নয় গল্পের বই, ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাও। দুপুরে টিভিতেই বা থাকছেটা কী? সন্ধেবেলার সিরিয়ালগুলোই তো দেখায় আবার। এমনিতেই তো মেগার গল্প এগোতে চায় না। ওই চর্বিতচর্বণ সিন দু'বার করে গিলতে ইচ্ছে করে? তাও পুরনো ভাল সিনেমা-টিনেমা দিলে টিভির সামনে বসে থাকা যায়। সময়ও কাটে। কালই তো কোন চ্যানেলে যেন 'সপ্তপদী' দেখাচ্ছিল। কীভাবে যে হু-হু করে লম্বা দুপুরটা পেরিয়ে গেল! আজ তেমন ধারার কোনও ছবি নেই। চলছে মুম্বইমার্কা ধেই ধেই নাচ আর ধুমধাড়াক্কা মারপিট। ওসব দেখা কি করবীর পোষায়? বি ডি ব্লকের লাইব্রেরি থেকে খানদু'য়েক গল্পের বই এনেছে কাল। যা কম আলো, আজ সেগুলো নিয়েও বসার উপায় নেই। চোখটা ইদানীং বেশ গড়বড় করছে। বাতি জ্বেলে নিলেও অক্ষরগুলো কেমন জড়িয়ে-জড়িয়ে যায়। ছানি পড়ার পূর্বলক্ষণ?

প্রতিমা বসার ঘরে ঘুরঘুর করছে। সোফা টেবিল ঝাড়াঝুড়ি চলছে বোধ হয়। ঠিকে কাজের মেয়েটি ঘরদোর মুছে দিয়েই খালাস, আসবাব সাফসুতরো রাখার দায়িত্ব প্রতিমারই। অনেকদিন এবাড়িতে থেকে করবীর ধাত সে বুঝে গেছে। বকুনি খাওয়ার ভয়ে কোথাও সে ধুলো জমতে দেয় না।

করবীর হঠাৎ মনে পড়ল, দিনতিনেক আগে রজনীগন্ধা এনেছিল এক গোছা। মর্নিংওয়াক থেকে ফেরার পথে। মেয়েদুটোর ঘরে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিয়েছিল গোছাটা। ফুলগুলো নিশ্চয়ই শুকিয়ে গেছে। ফ্লাওয়ার ভাসে বাসী ফুল মোটেই ভাল দেখায় না। ফেলে দিতে বলবে? করবী ডাকতে যাচ্ছিল, প্রতিমা তার আগেই হাজির। আপনমনে গজগজ করছে, “এই এক ঢং হয়েছে আকাশের। ঝরবি তো ঝর, ভাল করে ঝর। না সারাদিন শুধু ছ্যারছ্যার ছ্যারছ্যার...”

“তাতে তোর কী অসুবিধে হল?”

“আজও কাপড় কাচার মেশিন চালানো গেল না। ওদিকে লন্ড্রিব্যাগ তো উপচে পড়ছে। যেই তুমি কেচে দেবে বলেছ, অমনই তো দুই কন্যে কাঁড়ি-কাঁড়ি জামাকাপড় ফেলে দিয়ে যাচ্ছে!”

“আহা, ওরা পথেঘাটে বেরোয়! একই ঘেমো পোশাক কতদিন পরবে?”

“বেশি আহ্লাদ দিও না গো ওদের। মাথায় চড়ে বসবে। কাল আমাকে রূপসা মেয়েটা কী বলে জানো? দুধ-চা খেলে তার নাকি অম্বল হয়। কালো চা দিতে হবে। সাফ জানিয়ে দিয়েছি, এবাড়িতে একরকমই চা হয়, আমি ওসব লিকার-টিকার বানাতে জানি না।”

“ওমা, ব্ল্যাক-টি বানানো কী এমন হাতিঘোড়া কাজ? কাপে দুধ না দিয়ে শুধু লিকারটা ঢালবি!” করবী মুচকি হাসল, “আমারই তো লাভ হবে রে। দুধের খরচ বাঁচবে।”

প্রতিমা আদৌ প্রসন্ন হল না। করবী যে পয়সা বাঁচানোর জন্য কথাটা বলছে না, তা প্রতিমা ভালমতোই জানে। গোমড়া গলায় বলল, “আর কাচাকুচির কী হবে? কালও যদি বৃষ্টি চলে?”

“অনন্তকাল তো ফেলে রাখা যাবে না। কাল চালিয়ে দিস মেশিন।”

“মেলব কোথায়?”

“কেন, ছাদের শেডের নীচে? ওখানে একটা দড়ি খাটিয়ে নিবি।”

“যা বলবে। আজ রাতের রান্নাবান্না কী হবে?”

ক্ষণকাল ভাবল করবী। সে আর অনুব্রত রাতে রুটি খায়। প্রতিমারও সেই অভ্যেসটি হয়ে গেছে। ইদানীং রাতে মাছ-মাংস, এমনকী, ডিমও ছেড়ে দিয়েছিল তারা। তবে মেয়েদুটোর জন্য এখন রাতে ভাত হচ্ছে রোজ। শুরু হয়েছে আমিষ পদ। দুটো মেয়ে সারাদিন কোথায় কী খায়, রাতে একটু ভালমন্দ না দিলে চলে?

করবী ভুরু কুঁচকে বলল, “ডিপ ফ্রিজে মুরগি আছে না?”

“হুঁ।”

“ওটাই রেঁধে ফ্যাল। আমরাও না হয় কাল দুপুরে মুরগি খেয়ে নেব।”

প্রতিমা কুটুস করে বলল, “যদি বাঁচে!”

করবী হেসে ফেলল, “অল্পবয়সি মেয়ে, ওরা কি আমাদের মতো খুঁটে-খুঁটে খাবে?”

“তা না গো, এমনই বলছিলাম,” প্রতিমাও হাসছে, “আর সঙ্গে ডাল, পটলের ডালনা তো থাকছেই। বেগুনও ভেজে দেব। আর কিছু?

“না, ঠিক আছে।”

কথা শেষ হতেও নড়ছে না প্রতিমা। করবী জিজ্ঞেস করল, “কী হল? এবার টিভি চালাবি, তাই তো?”

“হ্যাঁ মানে...একটা ভাল বই হচ্ছিল...”

“যত সব খুনোখুনি মারামারি, ভাল্লাগে?”

“না গো মামী। এটা অন্য রকম, 'আমি যে তোমার', খুব নাম করেছে!”

কাগজে সিনেমাটার সমালোচনা পড়েছে করবী। উদ্দাম প্রেমের ছবি। প্রতিমার বর বিয়ের চার বছর পরেই কোলে একটা ছেলে ধরিয়ে দিয়ে অন্য এক কাজের মেয়ের সঙ্গে ভেগেছিল। তারপরও যে প্রেমের ছবি দেখে প্রতিমা কী আনন্দ পায়...হয়তো স্বামীপরিত্যক্ত জীবনে আর কোনও পুরুষমানুষ আসেনি বলেই পর্দায় নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলা দেখে মনের খিধে মেটায়! হয়তো মধ্যবয়সি এই দেহটারও। এই বয়সে মেয়েমানুষের কামনা-বাসনা যে পুরোপুরি নেভে না, এ কে না জানে!

করবী মাথা নেড়ে বলল, “খোল টিভি। তবে আওয়াজ আস্তে। তোর মামার ঘুম যেন না ভেঙে যায়।”

ঘাড় নেড়ে চলে গেল প্রতিমা। মনে-মনে করবী হাসল একটু। দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাটি অনুব্রতর বড় প্রিয়। ব্যাঘাত ঘটলে বাবু বেজায় খেপে যায়। ভাবতে অবাক লাগে, চাকরি করার সময়ে যার দিনরাতের জ্ঞান থাকত না, অসুরের মতো খাটত, অবসরের পর তারই কিনা এই অভ্যেসটি ধরে গেল? অথচ গৃহবধূ করবী কোনওদিনই দুপুরে ঘুমোতে পারল না। ছেলেদের নিয়ে সারাদিন

ব্যস্ত থাকার কাল তো সে কবেই পেরিয়ে এসেছে, দুপুরগুলো তো তার ফাঁকাই পড়ে থাকে, তবুও না। কী আর করা, দুটো মানুষ কি এক রকম হয়? অবসরকালীন জীবনটাও কেমন দিব্যি তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছে অনুব্রত। আয়েস করে ঘুম থেকে উঠল, বাজারে গেল কোনওদিন, কিংবা গেল না, দু' খানা কাগজ পড়ছে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, টিভি খুলে খবর শুনছে, খেলা দেখছে, বিকেলে সেজেগুজে চলে গেল আড্ডায়, ফিরে এক-দু' পেগ হুইস্কি, তারপর রাতের আহারটি সেরে সাড়ে দশটার মধ্যে বিছানায়। মনেই হয় না, চৌত্রিশ বছরের চাকরি জীবনটাকে সে এতটুকু মিস করছে! অথচ ছেলেদের পিছনে করবীও তো না হোক পঁচিশ-তিরিশটা বছর প্রাণপাত করেছে। সেদিক দিয়ে ভাবলে তারও তো এখন অবসর জীবন। খেয়ে, ঘুমিয়ে টিভি দেখে, গল্পগুজব করেই তো চিত্ত প্রফুল্ল থাকা উচিত করবীর। কেন যে হয় না তেমনটা? তার কাজটা চাকরি ছিল না বলেই কি এই শূন্যতাবোধ? এই জ্বালাপোড়া?

কোথায় যেন একটা কোকিল ডেকে উঠল। কী আজব কাণ্ড, ভাদ্রমাসে কুহু? এই বৃষ্টির মাঝে? আশপাশের কোনও বাড়িতে পুষল নাকি? কত রকমের যে শখ হয় মানুষের! ভাবনার মাঝে বসার ঘরেও টেলিফোনের ঝঙ্কার। কে রে বাবা? কবে কাগজে পেয়িং গেস্টের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, এখনও খোঁজখবর করে বটে লোকজন।

করবী গলা উঁচিয়ে বলল, "প্রতিমা... দ্যাখ তো কে?"

ক্ষণ পরেই প্রতিমার উল্লসিত স্বর, "তাড়াতাড়ি এসো। বড়দা ফোন করেছে গো।"

করবী রীতিমতো অবাক! রাজা তো ফোন করে রবিবারে। সকালবেলা। সিডনিতে তখন দুপুর। ওদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর একবার বাবা-মাকে স্মরণ করা রাজার এখন রুটিনের মধ্যে পড়ে বোধ হয়।

ফোন কানে চেপে করবী বলল, "কী রে, হঠাৎ বুধবারে কেন? সিডনিতে আজ ছুটি আছে নাকি?"

"না মা। আমরা তো এখন কেয়ার্নসে। বেড়াতে এসেছি। বাবা তোমায় কিছু বলেনি?"

"কই, না তো!"

"আমি তো সিডনি এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিলাম। দারুণ একটা প্যাকেজ পেয়েছি। টু নাইটস, থ্রি ডেজ। শুধু আমার আর আইরিনের খরচ লাগছে। মিনি পুরো ফ্রি। প্লেন ফেয়ার, থাকা, খাওয়া, ক্রুজ, এভরি থিং।"

"বাঃ, খুব ভাল। এনজয় কর।"

"তোমার সেই পেয়িং গেস্টদের কী খবর?"

"ঠিকই আছে। হঠাৎ তাদের কথা জানতে চাইছিস যে বড়?"

"উফ, কাল বাবা যা এক্সপ্লোড করছিল! তোমার নাকি ভীমরতি ধরেছে। অচেনা, অজানা মেয়েদের দায় ঘাড়ে নেওয়া মোটেই উচিত হয়নি। তুমি নাকি প্রফেশনাল রিলেশনশিপটাকে পার্সোনাল করে ফেলছ!"

"তোর বাবার কথা ছাড়। অকারণে চেঁচায়।"

"ইন ফ্যাক্ট, আমিও খুব একটা আমল দিইনি। আমার তো মনে হয়, তুমি ঠিক কাজই করেছ। বাড়তি স্পেস পজেশনে থাকলে সেটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করাটাই তো আধুনিক কনসেপ্ট। আর তুমি সেটাকে মানিটারি বেনিফিটে কনভার্ট করেছ। দ্যাটস গ্রেট মা।"

চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ছেলের যোগ্য মতামতই বটে। করবী কেন পেয়িং গেস্ট রাখতে গেল, রাজা তার কী বুঝবে? সূক্ষ্ম বোধ-টোধগুলো থাকলে শর্মিষ্ঠার মতো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা চুরচুর হয়ে যায়? হিরে ফেলে আইরিনের মতো একটা রঙিন কাঁচকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করতে পারে?

করবী আলগা ভাবে বলল, "আমি অবশ্য অত কিছু ভেবে রাখিনি।"

"তোমার প্র্যাগম্যাটিজ্‌মই তোমাকে গাইড করেছে মা।"

করবী মনে মনে বলল, বাস্তববাদী আমি ছিলাম না রে, বিশ্বাস কর। তোরাই আমায় গড়ে তুলেছিস। তিলে-তিলে। তুই আর ছোটু। তোরাই আমাকে ঠোক্কর দিয়ে-দিয়ে শিখিয়েছিস, স্বপ্ন, আবেগ প্রত্যাশা, নেহাতই ফাঁপা বুলি। ডানা মেলা পাখিদের দিকে শুধু তাকিয়েই থাকতে হয়, কোনও কিছু চাইতে নেই।

করবী গলা ঝেড়ে বলল, "কথাটা তোর বাবাকে বোঝাস।"

"হাঃ, ড্যাড নিজে যা ভাববে, সেটাই আল্টিমেট। বাই দ্য ওয়ে, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি। তোমার পিজিদের আইডেন্টিটি ভাল করে চেক করে নিয়েছ তো?"

"যতটা সম্ভব। ভোটার কার্ড, ইউনিভার্সিটির আই ডি। রিসার্চ কলার মেয়েটার তো প্যান কার্ডও আছে।"

"একটা করে কপি কিন্তু রেখে দিও। তোমাদের কলকাতায় আজকাল যা সব কাণ্ড ঘটছে শুনি।"

'তোমাদের' শব্দটা খচ করে লাগল বুকে। এই শহরটা আর রাজার নয়। অথচ রাজার এখানেই শিক্ষাদীক্ষা, এখানে একটু-একটু করে বড় হয়েছে, এখান থেকেই সংগ্রহ করেছে বিদেশ যাওয়ার রসদ। নিজেকে বিক্রি করার ক্ষমতাটাই হয়তো রাজার কাছে প্র্যাগমাটিজম!

করবী আলতো করে বলল, "তোদের সিডনিতে বুঝি কোনও আজেবাজে ইনসিডেন্ট ঘটে না?"

"না, না, তা কেন! কসমোপলিটান শহরের এটাই তো নেচার। কার কী অভিসন্ধি থাকে...তাই তোমাকে অ্যালার্ট করা আর কি! তুমি অবশ্য চিরকালই সাবধানী। সুইমিং ক্লাবে সাঁতার শেখাতে নিয়ে গিয়ে যা নার্ভাস মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে!"

যাক, পুরোপুরি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়নি তা হলে! বয়সের ভারে আক্রান্ত হলে একদিন স্মৃতির শিকড়ে টান তবে পড়তেও পারে। করবী হয়তো তখন আর থাকবে না, এই যা। করবী প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চাইল, "তোরা সিডনি কবে ফিরছিস?"

"কাল। ইভনিং ফ্লাইটে। পরশু অফিস জয়েন করব। খামোকা উইকএন্ডের ছুটি দুটো অপচয় করি কেন বলো?"

"ঠিক, একদম ঠিক। তোর হিসেবে কখনও কোনও গোলমাল হয়? সি এ পড়াটা তোর সার্থক।"

"হা হা হা! থ্যাঙ্কস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট!" করবীর ব্যঙ্গটাকে শিরোপা বলে ধরে নিয়েছে রাজা। আহ্লাদিত স্বরে বলল, "তোমাকে এখন ফোন করলাম কেন সেটা আন্দাজ করতে পার?"

"আমাদের কেয়ার্নস বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলি, বোধ হয় সেটা ভেবেই..."

"এক্সলেন্ট! দারুণ বাস্কেট করেছ। একদম থ্রি পয়েন্টার। এখন আমরা কোথায় বসে আছি জানো? গ্রেট বেরিয়ার রিফের যে আইল্যান্ডে তোমাদের ডে-স্পেন্ট করাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, ওখানেই বিচ রেস্তোরাঁয় ক্র্যাব সাঁটাচ্ছি। আইরিন আর মিমি আবার গেল স্নোর্কেলিং করতে। অনেক ছবি তুলছি। ফেসবুকে আপলোড করে দেব। দেখো কিন্তু।"

অ্যাকাউন্ট থাকলেও কদাচিৎ ফেসবুকে বসে করবী। তবু বলল, "আচ্ছা।"

"আজ তা হলে ছাড়ছি? তুমিও বিজনেস চালিয়ে যাও। শুধু বাবাকে একটু তুইয়ে-বুইয়ে চলো, যেন আবার কমপ্লেন না শুনতে হয়।"

শেষ বাক্যটি ধাক্কা মারল করবীর মাথায়। ফোন ছেড়ে বুম বসে রইল একটুক্ষণ। তার পর উঠে গেল শোওয়ার ঘরে। ডবল-বেড খাটের একেবারে মধ্যিখানে শুয়ে আছে অনুব্রত। অভ্যেসমতো বাঁ কাত ফিরে। দীর্ঘ দেহখানা সামান্য কুঁকড়ে। ভঙ্গিটা এত পরিচিত, কিন্তু মানুষটা কেন যে এখনও আধচেনা রয়ে গেল? করবীকে আঘাত করে কী যে সুখ পায়!

ঘুমের ঘোরে অনুব্রত নড়ে উঠল হঠাৎ। শুল চিত হয়ে। আবার পাশ ফিরেছে। খাটে বসল করবী। গমগমে স্বরে ডাকল, "অ্যাই, শুনছ?"

পাতলা হয়ে আসা ঘুমে অনুব্রত সাড়া দিল, "উঁ?"

"অনেকক্ষণ শোওয়া হয়েছে। এবার জাগো।"

চোখ খুলেছে অনুব্রত। ভুরু কুঁচকে বলল, "কী হয়েছে? কটা বাজে?"

"পৌনে চারটে।"

"তা হলে তো এখনও একটু গড়াগড়ি দেওয়া যায়।"

"না, ওঠো।"

করবীর কাটা-কাটা উচ্চারণে এমন কিছু ছিল, এবার যেন চমকেছে অনুব্রত। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে বসল। ঈষৎ জড়ানো গলায় বলল, "হয়েছেটা কী?"

"তোমার বড় ছেলের ফোন এসেছিল।"

সামান্য থমকে থেকে অনুব্রত বলল, "সে তো এখন কেয়ার্নসে।"

"জানলাম তো। তুমি কিন্তু বলোনি।"

"এ আর বলাবলির কী আছে? থাকে ও দেশে, গেছে বেড়াতে," করবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই স্বর নামল অনুব্রতর। চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, "আমার অত খেয়াল ছিল না।"

"ছেলের সঙ্গে ফোনাফুনির সময়ে আমাকে অপমান করাটা তো বেশ খেয়াল ছিল?"

"তোমাকে ইনসাল্ট করব কেন? কথা প্রসঙ্গে পেয়িং গেস্ট রাখার ব্যাপারটা এল..."

"বুঝেছ তা হলে, কী নিয়ে বলছি!"

ধরা পড়া অপরাধীর মতো মুখ করে অনুব্রত বলল, "আমার মনে হল হয়তো..."

"থাক, কৈফিয়ত দিতে হবে না। আমি তো বুঝেই গেছি, নেহাত কথা প্রসঙ্গেই তুমি পেয়িং গেস্ট রাখা নিয়ে আমার নামে চারদিকে নালিশ করে বেড়াচ্ছ। রাজাকে ফোন করছ, ছোটুকেও অভিযোগ জানানো হয়ে গেছে।

এমনকী, আমাদের শ্যামপুকুরের বাড়িতে পর্যন্ত...”

“শ্যামপুকুরে আমি ফোন করিনি। তোমার ভাই নিজেই জিজ্ঞেস করছিল...”

“তোমার কাছে? আমায় ফোন না করে? মেয়েদুটোকে আমি বাড়িতে রেখেছি, তুমি নয়, একথা জানা সত্ত্বেও?” করবীর গলা ভারী হল, “সমু আমায় সব বলেছে। তুমি আমার সম্পর্কে যা-যা টিজিং কমেন্ট করেছ, সব।”

“ছাড়ো তো। কেন এক ব্যাপার নিয়ে কচলাচ্ছ?” অনুব্রত খাট থেকে নামার উপক্রম করল। দরজার দিকে তাকিয়ে বলল, “প্রতিমা চা দেবে না?”

“থামো। যথা সময়ে তোমার মুখের সামনে চা ধরা হবে,” করবীর গলা ক্রমশ ধারাল। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, “দুনিয়াসুদ্ধ লোকের কাছে আমাকে হেয় করতে চেয়ে তোমার কি লাভ হচ্ছে বল তো? কোনও বিশেষ ধরনের সুখ পাচ্ছ কি?”

তিরটা এবার বিঁধেছে। অনুব্রত বিরক্ত স্বরে বলল, “তোমাকে মোটেই ছোট করা হয়নি। মেয়েগুলোকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছ, আমি তাই নিয়ে নিজের মত জানিয়েছি। আশা করি, বাড়ির কর্তা হিসেবে সে রাইট আমার আছে।”

“তা কি বলার অপেক্ষা রাখে!” করবীর গলায় বিদ্রূপ ঝরল, “শুধু সংসারের গৃহিণী হিসেবে আমার ইচ্ছেমতো কিছু করার কোনও অধিকার নেই! সংসারের কণামাত্র ক্ষতি না করেও যদি করি, তবুও না।”

“সেন্টু মারা ডায়ালগ দিও না। তুমি যা করছ, তা কি আদিখ্যেতা নয়? রোজ ওদের জন্য রাজকীয় ব্রেকফাস্ট বানানো চলছে, লুচি, আলুর পরোটা, চিকেন স্যান্ডউইচ, ডিমসেদ্ধ, কলা...য়েন স্টার হোটেলের নাস্তা! বিকেলে ওরা বাড়ি এলে জলখাবার পাঠাচ্ছ! কথা ছিল দেওয়ার? নিজে গিয়ে ওদের ঘর গুছিয়ে দিয়ে আসছ। কেন? তারা পারে না? কাপড়চোপড়গুলো পর্যন্ত কাচিয়ে দেওয়া শুরু করলে? মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় হয় এত কিছু? তোমার ভোরবেলার সখীদের জিজ্ঞেস করে দেখো তো, কোনও বাড়িতে পিজিদের এরকম রাজকীয় বিলাস জোটে কিনা!” অনুব্রতর গলা তীক্ষ্ণ হল, “সব্বাইকে আমি এগুলোই বলেছি। অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক, সেটা খুব অন্যায় হয়েছে।”

“ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তো আমি তুলিনি। শুধু ভাবতে খারাপ লাগছে, ছোটখাটো ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে মনটাকে তুমি সঙ্কীর্ণ করে ফেলছ। দুটো বাচ্চা-বাচ্চা মেয়ে, বাড়িঘর ছেড়ে এখানে আছে, এদের শুধু একটু হোমলি কমফর্ট দিচ্ছি। এজন্য আমাদের বিস্তর খাটাখাটুনি যাচ্ছে, গলদঘর্ম হচ্ছি, অতি সাধারণ কিছু আরাম জোগাতে আমাদের নাভিশ্বাস উঠছে, তাও তো নয়। বিনিময়ে যা পাব, আমাদের বুড়োবুড়ির জন্য সেটুকুই তো যথেষ্ট। অন্তত তোমার পেনশন থেকে তো ওদের পিছনে টাকা ঢালতে হবে না।”

“হয়েছে কিন্তু। নতুন ফার্নিচারগুলো তো আসমান থেকে পড়েনি।”

“কয়েকটা মাস যেতে দাও, তোমার পয়সা সুদে-আসলে শোধ করে দেব!” করবীর গলা দৃঢ়তর হল, “একটা কথা স্পষ্ট বলে রাখছি। যতই ব্যঙ্গবিদ্রূপ কর, আমি কিন্তু ওদের রাখবই। পদে-পদে তোমার এই নানা কৌশলে আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা, এতে কোনও ফল হবে না।”

মুখ দেখে বোঝা যায়, অনুব্রতর একটুও পছন্দ নয় কথাগুলো। তা হোক, করবী খানিক তৃপ্তি পেল তো। বলাটা জরুরি ছিল, এবার থেকে সমঝে চলুক অনুব্রত। আশ্চর্য, মেয়েদুটোকে একটু বাড়তি যত্নআত্তি করা কি দোষের? ঝাড়াইবাছাই করে আট-ন'টি মেয়েকে ডেকেছিল বাড়িতে, তার মধ্যে থেকে শেষমেশ রূপসা আর সম্পূর্ণাকে রাখল, সে তো নেহাত অকারণে নয়। রূপসা শুধু বিদুষীই নয়, যথেষ্ট সভ্যভব্য, বিনয়ী। কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে! আর সম্পূর্ণা নেহাত গোবেচারা বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় তো খুবই ভাল। তা ছাড়া মেয়েটির বাবা এমনভাবে ধরে পড়ল, যেন সম্পূর্ণা এখানে না থাকতে পারলে ওর পড়াশোনাই বরবাদ হয়ে যাবে! বেশভূষা দেখে খুব একটা অবস্থাপন্ন মনে হয় না বাবাটিকে। সে যখন কষ্ট করেও মেয়েকে রাখতে চায় এখানে, তাকে একটু সাহায্য করলে ক্ষতি কী! মেয়েটাকেও নয় একটু খাতিরদারিই করল।

ব্যালকনিতে ফিরে এসব কথাই ভাবছিল করবী। এক সময়ে চা দিয়ে গেল প্রতিমা। বৃষ্টিও থেমেছে। একটু-একটু করে সরছে মেঘ, গড়াচ্ছে বিকেল। আলো যেন বেড়েছিল সামান্য, আবার পড়েও এল।

সম্পূর্ণা ফিরল পৌনে ছ'টা নাগাদ। ব্যালকনি থেকেই করবী দেখতে পেল, গেট ঠেলে ঢুকছে মেয়েটা। কাঁধে ভারী ব্যাগ, হাতে রঙিন ছাতা, পরনে সালোয়ার-কামিজ।

কী ভেবে খাওয়ার জায়গাটায় এল করবী। শান্ত পায়ে দোতলায় এসে চটি ছাড়ল সম্পূর্ণা। রবারের স্যান্ডেল গলিয়ে ঘরের পানে এগোচ্ছে।

করবী স্মিত মুখে বলল, “আজ তোমায় অনেকটা দেরি হল যে? কাল তো চারটের মধ্যে ফিরেছিলে?”

এবাড়িতে দু' সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, এখনও জড়তা কাটেনি সম্পূর্ণার। নিচু স্বরে বলল, “আজ প্র্যাক্টিক্যাল ছিল। এক্সপেরিমেন্ট শেষ না হলে তো বেরনো যাবে না।”

“ক্লাস-টাস তা হলে করছ ঠিকমতো?”

“করতেই হয়। খুব কড়াকড়ি।”

“তাই বুঝি?” করবী ইচ্ছে করে গলা ওঠাল। শোওয়ার ঘরে অনুব্রত, সম্ভবত বেরনোর জন্য তৈরি হচ্ছে। অনুব্রত যাতে শুনতে পায়, এমনভাবে জিজ্ঞেস করল, “দুপুরে আজ কী খেলে?”

“চাউমিন।”

“তোমাদের ক্যান্টিনে?” করবী নাক কুঁচকোল, “খুব খারাপ বানায় নিশ্চয়ই? সস-ফস ঢেলে একটা কিম্ভূতকিমাকার...”

“আমার মন্দ লাগে না।”

“খিদের পেটে বিষও অমৃত! সেই কোন সকালে খেয়ে বেরও...” করবী আর এক পর্দা গলা তুলল, “আমি নিজের হাতে প্রতিমাকে চাউমিন বানানো শিখিয়েছি। রবিবার করতে বলব, খেয়ে দেখো, কেমন সুস্বাদু!”

সম্পূর্ণা অল্প ঠোঁট ফাঁক করে হাসল।

করবী বলল, “এখন একটু চা খাবে তো?”

“না হলেও চলবে। আমার তো চায়ের তেমন নেশা নেই।”

“আরে, খাও-খাও,” দোতলায় প্রতিমাকে এদিক-ওদিক দেখতে না পেয়ে সিঁড়ির মুখে গিয়ে নির্দেশ ছুঁড়ল করবী, “দু' কাপ চায়ের জল বসা তো। তোর মামা যদি খায় তো তিন কাপ। সঙ্গে একটু মুড়ি-বাদামও মেখে দিস মেয়েটাকে।”

সম্পূর্ণা আরও যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। ওকে চাঙ্গা করতেই বুঝি করবী বলল, “সর্বক্ষণ এত জড়োসড়ো হয়ে থাক কেন? চনমনে হও। ইউনিভার্সিটিতে বন্ধুবান্ধব হল?”

“দু' চার জন।”

“মাত্র? একটু মেলামেশা করো। সন্ধেবেলা শুধুই বইয়ে মুখ গুঁজে না থেকে বসার ঘরে এসে একটু টিভি-ফিবিও তো দেখতে পার। রূপসার তো তাও ল্যাপটপ আছে, সে যা হোক খুটুরখাটুর করে। তুমি চাইলে আমাদের কম্পিউটারে গিয়েও বসতে পার...”

পরামর্শ বিতরণের মাঝেই করবী দেখতে পেল অনুব্রতকে। ঘর থেকে বেরিয়েছে। বিকেলের সাজ করে গটগটিয়ে চলে গেল সামনে দিয়ে। মুখখানা যেন তোলো হাঁড়ি! সিঁড়ির গেটটা অনাবশ্যক শব্দ করে যেন বন্ধ করল আজ।

রাতে খাওয়ার টেবিলেও অনুব্রত গোমড়া। করবী টের পাচ্ছিল, তখন সম্পূর্ণাকে আপ্যায়নটা এখনও পরিপাক করে উঠতে পারেনি অনুব্রত। সান্ধ্যভ্রমণের পর এক পেগের জায়গায় আজ দু' পেগ হুইস্কি নিয়েছিল, তবুও। রূপসা আর সম্পূর্ণাও খেতে বসছে একসঙ্গে। এটাই এখন এবাড়ির রেওয়াজ। অন্য দিন আড়ে-আড়ে মেয়ে দুটোকে দেখে অনুব্রত। আজ চোখ তুলে তাকাচ্ছেই না।

করবীর মজা লাগছিল! সত্তর পেরনো লোকটা আবার যেন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে। সেই কচি রাজার মতো রাগ, পুচকে ছোটুর মতো গোঁ। বোঝা যায়, বাপ-ছেলেরা একই ধাতুতে গড়া!

রূপসা ডাল দিয়ে ভাত মাখছিল। হাত থামিয়ে হঠাৎ বলল, “কাল আমি কিন্তু ব্রেকফাস্ট খাব না মাসিমা।”

“কেন?”

“ভোর-ভোর বেরিয়ে যাব। ফিরব রবিবার রাতে।”

“বাড়ি যাচ্ছ বুঝি?”

“না। দেখেছেন নিশ্চয়ই, ঘাটালে বন্যা হয়েছে! যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে একটা টিম যাচ্ছে রিলিফ নিয়ে। আমিও আছি টিমে।”

“ওমা, ইউনিভার্সিটি এরকম পাঠায় নাকি?”

“না, না, আমরা একটা গ্রুপ মতো তৈরি করেছি। কিছু-কিছু স্টুডেন্ট, অধ্যাপক...আমরা রিসার্চ স্কলাররাও আছি কয়েকজন। আমরাই টাকাপয়সা তুলেছি, জামাকাপড় চালডালও সাধ্যমতো জোগাড় করেছি...”

“তুমি এসব করে বেড়াও?” আচমকা অনুব্রতর ঝাঁঝালো স্বর বেজে উঠেছে, “লেখাপড়া শিকেয় তুলে যত্ত সব অকাজ!”

“তা কেন মেসোমশাই?” রূপসা নরমভাবেই বলল, “বিপন্ন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো তো খারাপ কিছু নয়।”

“তোমার অ্যালটেড কাজ করাটাই তোমার একমাত্র ডিউটি। ভুলে যেও না, তার জন্য তুমি সরকারের ঘর থেকে মাসে-মাসে টাকা পাচ্ছ।”

“সরকারের টাকা তো জনগণেরই টাকা। তার মধ্যে তো বন্যায় ডুবে যাওয়া, ঘরবাড়ি হারানো মানুষগুলোও পড়ে? তাদের বিপদ-আপদে সাহায্য

করাটা তো আমাদের কর্তব্যও বটে।"

"হুঁঃ, ওভাবে চুলচেরা বিচার হয়? সরকার পাবলিকের কাছ থেকে ট্যাক্স নেয়। সুতরাং, বিপদ-আপদ থেকে তাদের রক্ষা করা সরকারেরই ডিউটি।"

"সে তো বটেই মেসোমশাই। তবু নাগরিক হিসেবে আমাদেরও তো কিছু করা উচিত? কত সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছি আমরা, পাবলিকের ট্যাক্সের টাকায় লেখাপড়া শিখছি, কেউ-কেউ হয়তো বিদেশেও চলে যাব। অনেকটাই অ্যাফ্লুয়েন্ট লাইফ লিড করব..."

"প্রত্যেকটা সিটিজেনের সেই রাইট আছে। দেশে যা-যা সুবিধে পায়, সেগুলোও তার প্রাপ্য। তেমনই বিদেশের যে কোনও প্রান্তে গিয়ে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী টাকা রোজগারটাও তার অধিকার।"

"কিন্তু অধিকার তো একটা দু' মুখো মুদ্রা মেসোমশাই। তার উল্টো পিঠে কর্তব্য বলেও একটা কথা আছে," রূপসা হাসল, "মাসিমার মুখে শুনেছি আপনি ডিভিসিতে খুব বড় চাকরি করতেন। তখন নিশ্চয়ই বহুবার লেবার ট্রাবল ফেস করেছেন?"

"হ্যাঁ। করেছি। সো?"

"ভেবে দেখুন, দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের সময় শ্রমিকরা তাদের অধিকারের কথা বলেছে। তখন কি আপনার মনে হয়নি, কর্তব্যের দিকটাও এদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত? জীবনের প্রতিটি অধিকারের ক্ষেত্রে নিয়মটা কি একই নয়, আপনিই বলুন? আর কর্তব্য ছাড়াও বন্যার্তদের সাহায্য করার একটা মানবিক দিকও তো আছে।"

অনুব্রত আর জবাব দিল না। গোঁজ মুখে খাচ্ছে। আহার শেষ করে, দীর্ঘকালের টেবিল ম্যানার্স ভুলে, কাউকে কিছু না বলেই সোজা বেসিনে। রূপসা, সম্পূর্ণা কেউই অবশ্য খেয়াল করল না ব্যাপারটা। খেয়েদেয়ে ঘরে চলে গেছে তারা। কিন্তু করবীর নজর এড়ায়নি। প্রতিমা বাসনকোসন নিয়ে তেতলায় উঠে যাওয়ার পর এসেছে বসার ঘরে। অনুব্রতর পাশে।

টিভি চালিয়ে কী একটা ক্রিকেট ম্যাচ দেখছিল অনুব্রত। করবী আসামাত্রই রিমোটখানা রেখে দিল সেন্টার টেবিলে। গুমোট গলায় বলল, "নাও, এখন তো তোমার সিরিয়ালের টাইম।"

"এই সিরিয়ালটা তো তুমিও দ্যাখো?"

"ইচ্ছে করছে না এখন। শুতে যাব।"

"খুব চটে আছ? মেয়েটার সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠতে পারলে না বলে?"

"হুঁঃ, জোর দাবড়ানি দিতাম। তোমার কথা ভেবে চেপে গেলাম। মহা বখতিয়ার মেয়ে! বুলির ফুলঝুরি ছুটছে! মানবিকতা...অধিকার...কর্তব্য..."

"কথাগুলো বুঝি খুব গায়ে লেগেছে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের?" করবী মুখখানা নিরীহ করল।

"ফালতু বকবক কোরো না তো। ভাল লাগে না।"

"তাই? নাকি দুই ছেলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে? যারা শুধু অধিকারটাই বোঝে। কর্তব্যের ব্যাপারে টুঁ টুঁ!"

কটমট চোখে স্ত্রীকে এক ঝলক দেখল অনুব্রত। আবার ঘুরিয়ে নিল মুখ।

মানুষটা কি ফুঁসছে? নাকি গরম বাতাস বইছে বুকের মাঝে? করবী বুঝতে পারছিল না।

ক্যান্টিনে আজ বেজায় ভিড়। দুটো ঘরের একটাতেও বসার জায়গা নেই, কাউন্টারেও কিলবিল করছে মাথা। একবার উঁকি দিয়ে সরে এল সম্পূর্ণা। কিন্তু পেট চুঁইচুঁই করছে যে। সকালে জলখাবারটা খারাপ ছিল না আজ। চার পিস টোস্ট, ডিম, কলা, সন্দেশ। তবে সাড়ে আটটার প্রাতঃরাশ বেলা দুটোয় কি আর থাকে পাকস্থলীতে? তার উপর টানা তিন পিরিয়ড থিয়োরি ক্লাস। স্টিরিওকেমিস্ট্রির ভারে মাথাটা দপদপ করছে যেন।

সামান্য চিন্তা করে সম্পূর্ণা সায়েন্স কলেজের বাইরে এল। বসু বিজ্ঞানমন্দিরের ওপারে একটা লোক ফুটপাথে রোল বানায়, দেখেছে আসা-যাওয়ার পথে। পায়ে-পায়ে চলেই গেল দোকানটায়। ভাদ্রের দুপুরে খদ্দের নেই তেমন, মিনিটকয়েকের মধ্যে মিলেছে এগরোল। সেদ্ধ আলু, শসা পেঁয়াজ পুরে বেশ মোটা বানিয়েছে, দু'-তিন ঘণ্টা দিব্যি ভরা থাকবে পেট। এগরোলে কামড় বসিয়ে সম্পূর্ণা আচমকা বাঁয়ে তাকাল। পরক্ষণে ডাইনে। নাঃ, সেরকম কেউ তো নেই এদিকওদিক। তবু বুকটা ধড়াস করে উঠল কেন? এই হঠাৎ চমকে ওঠার রোগটা কিছুতেই যে কেন তার পিছু ছাড়ছে না?

সম্পূর্ণা নিজেকে শক্ত করতে চাইল। যুক্তির ঢাল সাজাচ্ছে মনে-মনে। যাকে নিয়ে তার শঙ্কা, সে তো এখন বহু যোজন দূরে। ফাঁদ কেটে সম্পূর্ণা তো বেরিয়ে আসতে পেরেছে, আর তার কীসের ভয়? শ্যামবাজারের লেডিজ হোস্টেলটা কীভাবে যেন চিনে ফেলেছিল। তার নতুন ডেরাটির হদিস পাওয়া অত সোজা নয়। সায়েন্স কলেজে হানা দেওয়ার সাহস পাবে কী? মনে হয় না। কোনও মেয়ের ক্ষণিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার জন্য যারা মুখিয়ে থাকে, অথচ অশান্তির আশঙ্কা দেখলে নিজের পিঠ বাঁচাতে তৎপর হয়, তারা কি দুঃসাহসী হতে পারে? ভাবনাটায় সম্পূর্ণা একটু জোর পেল যেন। ফিরছে কলেজে। গেট দিয়ে ঢুকছে, ক্লাসেরই এক দঙ্গলের মুখোমুখি। বিনীতা, তৃষ্ণা, শর্বরী, শ্যামলেন্দু, কৌস্তুভ। নামগুলোই জানে সম্পূর্ণা, বন্ধুত্ব নেই বিশেষ। প্রাণবন্ত ছেলেমেয়েদের মাঝে সে হাঁসফাঁস করে কিনা!

আজও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, শর্বরী খপ করে ধরেছে, "অ্যাই, কোথায় গিয়েছিলি রে?"

সম্পূর্ণা আমতা-আমতা করে বলল, "এই তো... কাছেই..."

"কাউকে মিট করতে বুঝি?"

"না, এগরোল খেতে।"

"যাঃ, চটকে দিলে তো!" চশমাপরা শ্যামলেন্দু মিটিমিটি হাসছে, "কোথায় একটু খেলিয়ে-খেলিয়ে জবাব দেবে, শর্বরী যাতে ইন্টারেস্ট পায়... তা নয়, এ একেবারে কঠোর গদ্য!"

সম্পূর্ণা অপ্রতিভ বোধ করল। বিনীতা হাত ধরেছে সম্পূর্ণার। অনুযোগের সুরে বলল, "তুই এত ছাড়া-ছাড়া থাকিস কেন রে? আমরা কি খুব খারাপ? তোর সঙ্গে মেশার যোগ্য নই?"

"না, না, তা কেন! তোমাদের কাউকে সেভাবে চিনি না তো!"

"এখানে আসার আগে আমরাই বা কে কাকে চিনতাম রে ভাই? সর্বদা পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ালে দোস্তিটা হবে কোত্থেকে?"

কোনওদিনই সম্পূর্ণা খুব উচ্ছল প্রকৃতির নয়। তা বলে এতটা গুটোনো স্বভাবেরও তো সে ছিল না। বর্ধমান টাউনে কো-এড কলেজে পড়েছে, সহপাঠী-সহপাঠিনীদের অনেকের সঙ্গে তার মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা ছিল, পৃথা, কাজল, শিল্পীদের বাড়িতেও সে গেছে কত বার। এই শহরটায় এসে কেন যে সে নিজেকে খোলের মধ্যে পুরে নিল? কারও সঙ্গে সহজ বন্ধুত্ব করতে কোথায় যে তার বাধে, তা একমাত্র সম্পূর্ণাই জানে। অতীতটা যদি তার প্রকাশিত হয়, ছিছিক্কার পড়ে যাবে না? এই বিনীতা, শর্বরীরাই হয়তো তখন তর্জনী উঠিয়ে দূরে সরিয়ে দেবে সম্পূর্ণাকে। তার চেয়ে কাছে না ঘেঁষাই শ্রেয়।

ঠোঁটে অবশ্য জোর করে একটা হাসি টানল সম্পূর্ণা। বলল, "এটা তোমাদের ভুল ধারণা। এই তো গল্প করছি। করছি না?"

"কথার বেশ প্যাঁচ জানিস তো!" কৌস্তুভ চোখ নাচাল, "চল, তা হলে বন্ধুত্বটা সেলিব্রেট করি।"

সম্পূর্ণা চোখ পিটপিট করল, "কীভাবে?"

"সকলকে একটা করে চপ খাইয়ে দে।"

ঈষৎ ফাঁপড়ে পড়ল সম্পূর্ণা। বিনীতারা সাতজন এবং সে নিজে। মানে মোট আট। ভেজিটেবল চপ অধিকাংশ সময়েই পাওয়া যায় না। ডিম, মাছ, মটন কিছু একটা নিতে হবে। অর্থাৎ কম-বেশি পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা। এর পর চায়ের ফরমাশও হবে নির্ঘাত। সর্বনাশ, আজকের মোট খরচ প্রায় একশোয় গিয়ে দাঁড়াবে যে! মাসে দেড় হাজার টাকা তার হাতখরচ, এভাবে পয়সা ওড়ানো কি তার সাজে? বাবা যে টাকাটা তার পিছনে খরচ করছে, সেটাই তো প্রায় সাধ্যের অতীত। চাষবাসের সুবাদে তারা মোটামুটি সম্পন্ন ঘর বটে, কিন্তু বাড়িতে নগদ অর্থ কী-ই বা আছে! তাকে কলকাতায় রেখে এম এসসি পড়াতে হয়তো বা ধারধোর করতে হচ্ছে বাবাকে। বর্ধমানে পড়লে বাবার অবশ্যই সাশ্রয় হত। কিন্তু নিজের দোষে সম্পূর্ণা এমন একটা জট পাকিয়ে ফেলল। আর তো ওই শহরে নিয়মিত যাতায়াত সম্ভব নয়। অন্তত বাবা-মা তো আর যেতে দেবেই না। ভাগ্যিস রেজাল্টটা ভাল হয়েছিল, নইলে পড়াশোনাতেই তো ইতি টানতে হত। অবশ্য ইউনিভার্সিটিতে এসে একটা প্রতিষ্ঠানে স্কলারশিপের আবেদন করেছে। যদি ওটা মিলে যায়, তবে খানিকটা অন্তত মুক্তি দিতে পারবে বাবাকে। তবে সেও তো নভেম্বর-ডিসেম্বরের আগে নয়। এই ক'মাস তাকে টিপে-টিপে চালাতেই হবে।

বিনীতা ঠেলছে, "কী রে, চপের কথায় ধ্যানস্থ হয়ে গেলি যে?"

সম্পূর্ণা নড়ে উঠল। চট করে সপ্রতিভতা আনল গলায়, "না তো! ভাবছিলাম ফিজিক্যালের ক্লাসটা না শুরু হয়ে যায়। টি বি এস এনট্রপি শুরু করবেন তো।"

"ও হ্যাঁ, তাও তো বটে," শ্যামলেন্দু মোবাইলে টাইম দেখল, "লেটে ক্লাসে ঢুকলে টি বি এস বহুত খ্যাচখ্যাচ করে।"

"চল তা হলে," বিনীতা সম্পূর্ণার পিঠে হাত রাখল, "চপটা কিন্তু ডিউ রইল। কাল খাইয়ে দিস। নইলে ওটা কিন্তু মোগলাই হয়ে যাবে!"

সহপাঠীদের সঙ্গে এগোচ্ছিল সম্পূর্ণা, ঝোলব্যাগে মোবাইল বাজছে। বের করে স্ক্রিনে চোখে রাখল। এক অচেনা নাম্বার। পর মুহূর্তেই শিরদাঁড়া বেয়ে হিমস্রোত। উঁহু, এ তো ভীষণভাবে চেনা। ভয়ঙ্করভাবে চেনা!

ঝট করে সম্পূর্ণা কলটা কেটে দিল।

তৃষা আলগাভাবে জিজ্ঞেস করল, "কে রে?"

সম্পূর্ণার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "কী জানি!"

"তা হলে ধরলি না যে বড়?"

"অচেনা, অজানা নাম্বার আমি ধরি না।"

"কেন রে? কেউ হয়তো ভাব করতে চাইছে..."

"ঘোড়ার মাথা!" বিনীতা মুখ বেঁকাল, "সার্ভিস প্রোভাইডারগুলো এমন বিরক্ত করে..."

আবার বাজছে ফোন। হৃদকম্প গোপন রেখে সম্পূর্ণা ফের তাকাল খুদে পর্দায়। হ্যাঁ, আবার সে! এ কী শুরু করল? তার সন্ধান না পেয়ে মোবাইলেই আক্রমণ চালাবে নাকি অহরহ? ইস, কেন যে সম্পূর্ণা মোবাইলের সিমটা বদলায়নি! আবার লাল বোতাম টিপে দিল সম্পূর্ণা। তারপর অফ করে দিল পুরোপুরি। কাউকে প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে বলে উঠল, "যেই হোক না কেন, ক্লাস শেষের আগে কথাই বলব না।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বিনীতা বলল, "তুই হয়তো খুব ইম্পর্ট্যান্ট কাউকে মিস করলি।"

সে আর বলতে! তার জীবনের শিবঠাকুরই তো ছিলেন ও প্রান্তে। মনে-মনে আওড়াল সম্পূর্ণা। জবাব দিল না। ফ্যাকাসে হেসে ঢুকেছে শ্রেণিকক্ষে। বুকে বিশ মণি পাথরের চাপ! এই উপদ্রব থেকে কি সম্পূর্ণার নিস্তার নেই?

রোল কল সেরে এনট্রপি সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনা করছেন টি বি এস। বিষয়টা কলেজেই পড়া, তবু এখনও এনট্রপির ধারণাটা সম্পূর্ণার কাছে পরিষ্কার নয়। তাতে অঙ্ক কষতে কিংবা প্রশ্নের উত্তর লিখতে অসুবিধে হয় না ঠিকই, কিন্তু মগজে একটা অস্বস্তি রয়েই গেছে। টি বি এস এখন ভালই বোঝাচ্ছেন বিষয়টা, অথচ সম্পূর্ণা মন বসাতে পারছে কই! দু'-দু'বার ফোনটা এসে তাকে এমন বেপথু করে দিয়েছে!

কেন যে অমন একটা বিশ্রী ভুল করেছিল সম্পূর্ণা! কী এমন বিশেষ গুণ ছিল চিনুদার। চেহারাটাই যা চটকদার। এখন অবশ্য ভাবতে গেলে স্রেফ লঙ্কা পায়রা মনে হয়। চিনুদার বাবা মানে সম্পূর্ণার বড় মামা বর্ধমান টাউনের নামজাদা ডাক্তার, তার খোশবাগের চেম্বারে দিনরাত রোগীদের ভিড়, বাড়িতে কাঁচা পয়সা ঢুকছে রাশি-রাশি, প্রকাণ্ড এক বাইক নিয়ে শহরময় চক্কর কাটা তার ছেলেটি তো নির্ভেজাল লঙ্কা পায়রাই বটে! সম্পূর্ণা তো নির্বোধ নয়, তবু সেই কিনা প্রেমে পড়ল চিনুদার? তাদের সম্পর্কটা সামাজিক নিয়মে নিষিদ্ধ জেনেও? আইনের চোখেও কি গ্রাহ্য হয় সম্পর্কটা? তবে তো পিছলে গেল পা! বয়সের দোষ? হবেও বা। সদ্য টিনএজ পেরনো সম্পূর্ণার কতটাই বা অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান ছিল? তা ছাড়া উদ্দাম মেলামেশা, অহরহ রূপের স্তুতি, নিষিদ্ধ উত্তেজনার পুলক, অনেক নীরস পাথরকেই তো গলিয়ে দেয়।

হায় রে, কেন যে সম্পূর্ণা বড়মামার বাড়িতে থেকে বি এসসিটা পড়তে গিয়েছিল? তাদের নিচিন্দা গ্রাম থেকে বর্ধমান বাসে প্রায় সোওয়া এক ঘণ্টার পথ। কিন্তু কার্জন গেটের কাছে থাকলে কলেজ করতে কত সুবিধে। শুধু যাতায়াতের ধকলটুকু বাঁচাতে কত কী যে সম্পূর্ণাকে হারাতে হল!

ঝপসা হয়ে গেছে ক্লাসরুমের ব্ল্যাকবোর্ড। সেখানে ফুটে উঠছে দৃশ্যের পর দৃশ্য। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে ধরে দেড়শো কিলোমিটার বেগে ছুটছে চিনুদার মোটরবাইক, পিছনে তাকে জড়িয়ে ধরে বসে সম্পূর্ণা। নরম বুক দুটো চাপ দিচ্ছে চিনুদার পিঠে। আরও যেন বেড়ে যাচ্ছে দ্বিচক্রযানের গতি। হাওয়ায় চুল এলোমেলো, গলায় জড়ানো দোপাট্টা উড়ছে।

চিনুদা চেঁচিয়ে উঠল, "কী রে, ভাল লাগছে তো?"

সম্পূর্ণার শরীর জুড়ে অচেনা শিহরণ! চিনুদার পিঠে মাথা রেখে বলল, "ভীষণ ভাল! ভীষণ!"

"মনে হচ্ছে না, একেবারে হালকা হয়ে গেছিস?"

"হ্যাঁ গো! বাতাসে ভাসছি যেন।"

"এভাবেই কিন্তু চিরকাল ভাসব আমরা! কারও কোনও বাধা মানব না!"

তখন কানে যেন মধুবর্ষণ করেছিল কথাগুলো! আস্তে-আস্তে চিনুদাতে ডুবছিল সম্পূর্ণা। সন্ধেবেলা শ্যামসায়রের পাড়ে বসে আছে দু'জনে। থাবার ভিতর তার নরম হাতখানা ধরে কচলাচ্ছে চিনুদা, বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে শিরায়-শিরায়! সম্পূর্ণার কামিজের ভিতর ঢুকে এল চিনুদার অবাধ্য হাত, উফ, কী রোমাঞ্চ! তারপর তো সেই রাত। মামী গেছে বাপের বাড়ি, রোগী দেখে হাক্লান্ত মামা ঘুমোচ্ছে অকাতরে। হঠাৎই দরজায় টকটক। পাল্লা খোলামাত্র সম্পূর্ণাকে জড়িয়ে ধরল চিনুদা। কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে! তার জেগে ওঠা পুরুষাঙ্গের চাপ টের পাচ্ছে সম্পূর্ণা। চূর্ণ হয়ে গেল ক্ষীণ মানসিক প্রতিরোধ। কী উন্মত্তের মতো সেদিন মিলেছিল দুটো শরীর! মিলনেও যেন পুরো তৃপ্তি হয়নি। কত ভঙ্গিমায় যে মোবাইলে ছবি তুলল নিরাবরণ সম্পূর্ণার।

পরের দিনই অবশ্য সম্পূর্ণার খুব অনুশোচনা হয়েছিল। কে যেন ভিতর থেকে বলছিল, কাজটা ভাল করছিস না রে। থেমে যা, থেমে যা, এবার অন্তত থাম। কিন্তু নিষেধের বেড়া একবার ভাঙলে আর কি প্রবৃত্তিকে রোখা যায়? কয়েক রাত পরে আবার চিনুদা হাজির। মামী বাড়িতে আছে জেনেও। সেদিনও সম্মোহিতের মতো নিজেকে অবারিত করে দিল সম্পূর্ণা, সর্বাঙ্গে শুষে নিল চিনুদার তাপ!

এভাবেই চলছিল খেলাটা। ভাগ্যিস কন্ডোম ব্যবহার করত চিনুদা! না হলে আরও যে কী সর্বনাশ হত! তারপর তো এক দুপুরে ধরা পড়ে গেল মামীর কাছে। মামী সেদিন মন্দিরে গিয়েছিল, সাত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে সম্পূর্ণারা আশাই করেনি। তখন বড্ড বেপরোয়াও হয়ে গিয়েছিল চিনুদা, সময়-অসময় মানতে চাইত না। সম্পূর্ণারই কি সে সময়ে জ্ঞানগম্যি থাকত! শরীরের নেশা যে কোন নরকে টেনে নিয়ে যায়!

দৃশ্যটায় এখনও গায়ে কাঁটা দেয় সম্পূর্ণার। দড়াম করে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে গেল মামী। দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন। বিছানায় সম্পূর্ণা আর তার আদরের ছেলে চিনু, কারওরই অঙ্গে সুতোটি পর্যন্ত নেই!

এর পর মামার বাড়ি থেকে সম্পূর্ণা যে বিতাড়িত হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু চিনুদা যে ওভাবে ভোল পাল্টাবে, সম্পূর্ণার কল্পনাতেও ছিল না। সে নাকি নিষ্পাপ দেবশিশু, সম্পূর্ণাই তাকে প্রলোভন দেখিয়ে প্ররোচিত করেছে নোংরামিতে! কী আশ্চর্য, মামা-মামী সেটাই বিশ্বাস করে নিল! আর সেই বয়ানেই কিনা সম্পূর্ণার বাবা-মার কাছে পৌঁছল সংবাদটা। রাগে-দুঃখে মা তো প্রায় গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল সম্পূর্ণার। একা বাবাই বুঝি অনুমান করেছিল, এক হাতে তালি বাজেনি। বড় শ্যালকের ছেলেটির স্বভাবচরিত্র মোটামুটি জানা ছিল যে! তার মেয়ে ভুল করতে পারে, কিন্তু অকর্মা ছেলেটিকে লুব্ধ করবে, এই গল্পটা ঠিক হজম করতে পারেনি বাবা। মা তখন জেদ ধরেছিল, মেয়ের আর পড়ে কাজ নেই, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও। সেই প্রস্তাবও বাবা নাকচ করে দিয়েছিল এককথায়। তার মেধাবী মেয়েটি লেখাপড়া শিখে অনেক উঁচুতে উঠবে, একথা বুঝি অন্তর থেকে বিশ্বাস করে বাবা। আর করে বলেই না ছেদ টানতে দেয়নি সম্পূর্ণার পড়াশোনায়!

সম্পূর্ণাও বাবার মুখ রেখেছে। ক্ষণিকের দুর্বলতা ভুলে, দুঃস্বপ্ন ঝেড়ে ফেলে, দুর্দান্ত ফল করেছে বি এসসিতে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হয়েও কলকাতায় এম এসসি পড়ার সুযোগ পেল, এ কি খুব সহজ ব্যাপার? কিন্তু চিনুদার জ্বালায় পড়াশোনা শেষ করাটাই না দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে!

ক্লাস শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চলে গেছেন টি বি এস। কৃষ্ণা আর বিনীতা দরজার কাছে গিয়ে কলকল করছে। সেখান থেকেই বিনীতা জিজ্ঞেস করল, "কী রে, টি বি এসের ঘোর এখনও কাটেনি মনে হচ্ছে?"

সম্পূর্ণা অপ্রস্তুত বোধ করল, "না, না, উঠছি তো।"

"তুই এখন সল্টলেকে থাকিস, তাই না? সেক্টর ওয়ানে?"

সম্পূর্ণা বিস্মিত হল। সে যে বর্ধমানের মেয়ে, এ তার সহপাঠীদের অজানা থাকার কথা নয়। সেমেস্টার শুরু হওয়ার দিনই এস আর ম্যাডাম প্রত্যেককে দাঁড় করিয়ে-করিয়ে কলেজের নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু তার ঠিকানা তো... একদিন অবশ্য কথায়-কথায় বৈশাখী নামের মেয়েটিকে বলেছিল, শ্যামবাজার থেকে সে এখন চলে এসেছে অন্যত্র। সকলের কাছে পৌঁছে গিয়েছে সমাচারটি! অর্থাৎ কেউ জানলেই এভাবে তার অতীতও তো রাষ্ট্র হতে পারে ক্লাসময়!

অসহজ ভাবটা লুকিয়ে সম্পূর্ণা বলল, "হ্যাঁ, এক বাড়িতে পিজি আছি।"

"আজকের মতো ক্লাসের পাট তো চুকল? এবার নিশ্চয়ই বেরোবি?"

"একবার ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরিতে যাব ভাবছি। স্টিরিওকেমিস্ট্রির একটা ভাল বই যদি পাওয়া যায়..."

"চান্স কম। স্যাররাই নাকি সব নিয়ে রাখেন। তবু গিয়ে দেখতে পারিস। আমরা তা হলে কাটি?"

"তোমরা চপ খাবে না?" সম্পূর্ণা জিজ্ঞেস করল, "এখন যদি চাও..."

"শ্যামলেন্দুরা তো হাওয়া হয়ে গেল। কাল হবে'খন।"

হাত নেড়ে চলে গেল বিনীতারা। ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণা প্রশস্ত করিডোরটায় এল। পায়ে-পায়ে এগোচ্ছে বিভাগীয় গ্রন্থাগারের দিকে। এই প্রাচীন বাড়িতে হেঁটে-চলে বেড়াতে কী যে এক মধুর অনুভূতি জাগে তার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন বোসের মতো মানুষরা এখানেই গবেষণা করেছেন, কত নতুন-নতুন কাজে মেতেছেন অসীমা চট্টোপাধ্যায়। সেখানে আজ ছাত্রী হয়ে আসতে পেরেছে সম্পূর্ণা, এ কি তার কম সৌভাগ্য! ভবিষ্যতে অজৈব রসায়ন নিয়ে গবেষণার ইচ্ছে আছে সম্পূর্ণার। সেই পথে এক ধাপ হলেও

এগিয়েছে তো! এতেই সমস্ত দুঃস্বপ্ন অনেকটা ফিকে হয়ে যায় না কি?

লাইব্রেরিতে কিছুক্ষণ বইপত্র ঘাঁটল সম্পূর্ণা। আলগা-আলগা উল্টাল কয়েকটা জার্নাল। তারপর মোটামুটি একটা পছন্দসই বই নিয়ে বেরিয়ে এল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে। দাঁড়িয়ে আছে বাসের প্রতীক্ষায়। হঠাৎ-হঠাৎ তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। অভ্যেস মতো। উল্টোডাঙার বাস আসতেই উঠে পড়ল ঝটপট। হালকা ভিড়, মানুষজন সবই অচেনা, তবু তাতেই যেন স্বস্তি।

উল্টোডাঙার মোড়ে নেমেই সম্পূর্ণা অটো পেয়ে গেল। দু'পাশে দুই মধ্যবয়সি সহযাত্রী, মধ্যিখানে সে। ডানদিকের হৃষ্টপুষ্ট লোকটা একটু যেন বেশিই চাপছে সম্পূর্ণাকে। মেয়েদের দেহ ছোঁয়ার বাসনা? নাকি এ সম্পূর্ণার মনের ভুল? কেন যে অচেনা পুরুষমাত্রই এক বিপজ্জনক প্রাণী মনে হয় আজকাল! সে ক্রমশ মনোরোগী হয়ে পড়ছে না তো?

তিন নম্বর ট্যাঙ্কটা পেরিয়ে সম্পূর্ণা নেমে পড়ল। অল্প একটু হাঁটা। যাচ্ছে দ্রুত পায়ে। একটু যেন সন্ত্রস্তভাবে। বাড়ির গেট ঠেলার আগেই আপনা আপনি দৃষ্টি ঘুরল ডাইনে-বাঁয়ে। ওফ, কী জ্বালা! কিছুতেই বশে থাকে না স্নায়ু!

দোতলায় উঠেই প্রতিমার সঙ্গে দেখা। সে গলা উঁচিয়ে ডাকছে, "মামী, সম্পূর্ণাদিদি এসে গেছে গো!"

কী হল রে বাবা? সম্পূর্ণা থতমত। দাঁড়িয়ে পড়েছে।

করবী শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। একটু ব্যগ্র স্বরে বলল, "অ্যাই মেয়ে, তোমার মোবাইলটা বন্ধ রেখেছ কেন? তোমার বাবা তোমাকে রিং করে-করে পাচ্ছেন না, শেষমেষ আমাকেই কল করেছিলেন..."

দুপুরের পর থেকে সম্পূর্ণা ইচ্ছে করেই আর মোবাইল খোলেনি। পারতপক্ষে বন্ধই রাখবে এখন থেকে। যত দিন না নতুন সিমকার্ড হয়।

স্বভাবসিদ্ধ নিচু গলায় সম্পূর্ণা বলল, "পর-পর ক্লাস ছিল তো, খুলতে ভুলে গেছি।"

"ও," এক পা এগোল করবী, "তোমার বাবা জানতে চাইছিলেন তোমাদের পুজোর ছুটি কবে পড়বে?"

"সে তো দেরি আছে। মহালয়ারও কয়েক দিন পর..."

"উনি বোধ হয় তোমার জন্য খুব উতলা হয়ে পড়েছেন। মেয়েকে ছেড়ে থাকা অভ্যেস নেই তো... কত কথা হল তোমায় নিয়ে। মেয়ের ব্যাপারে দেখি বাবার খুব চিন্তা।"

সম্পূর্ণা অস্ফুট স্বরে বলল, "বাবা একটু বেশিই ভাবে।"

"নিজেরা সংসারধর্ম করো, তখন টের পাবে বাবা-মায়ের কেন টেনশন হয়!" করবীর স্বর লঘু, "যাও, রেস্ট নাও। মনে করে ফোনটা কিন্তু কোরো!"

"হ্যাঁ মাসিমা।"

শ্লথ পায়ে ঘরে এল সম্পূর্ণা। রূপসা আজ আগে আগেই ফিরেছে। বিছানায় উপুড় হয়ে ল্যাপটপে মগ্ন। ঘাড় না ঘুরিয়ে বলল, "হাই!"

"হ্যালো রূপসাদি!" সম্পূর্ণা বসল বিছানায়, "আজ সন্ধের আগে ঢুকে পড়েছ যে বড়?"

"আমি রোজ রাত করে ফিরি? মাসিমা তা হলে কানমলা দিতেন না?"

"মাসিমা? না মেসোমশাই?"

অমনই রূপসা ঘাড় ঘুরিয়েছে। তেরচা চোখে বলল, "তুমি তো সাদামাটা চিজ নও! আমার মতো ব্যাক-ব্যাক কর না, কিন্তু ডেঞ্জার ম্যানকে চিনে গেছ।"

"না, না, মেসোমশাইও মানুষ খুব ভাল!" সম্পূর্ণা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "মাঝে-মাঝে একটু টেম্পার লুজ করেন, এই যা।"

"এটা খুবই ন্যাচারাল। বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে," ল্যাপটপ ছেড়ে বাবু হয়ে বসল রূপসা, "এই বয়সে পৌঁছে পুরুষরা বোধ হয় একটু বেশি ইনসিকিউরিটিতে ভোগে। মৃত্যুভয় নয় কিন্তু। সারাটা জীবন বউয়ের ঘাড়ে চেপে কাটায় তো। সেই মহিলাটি যদি পুটুস করে পৃথিবী থেকে কাট মারে? ভেবেই ভিতরে-ভিতরে নার্ভাস হয়ে পড়ে। তারই প্রতিফলন এই খিটখিটে মেজাজ।"

তর্ক করার অভ্যেস নেই সম্পূর্ণার। তবু বলল, "একেবারে জেনারালাইজ করাটা বোধ হয় ঠিক নয় রূপসাদি। কোনও তত্ত্ব খাড়া করারও কোনও মানে হয় না। মেসোমশাইকে তো আমরা আগে দেখিনি। বরাবরই হয়তো উনি একটু মেজাজি। এটাও তো দেখছ, ওঁর রাগের ভয়ে মাসিমা মোটেই জুজু হয়ে থাকেন না।"

"তাতে কী প্রমাণ হয়?"

"আমার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস বলে, ওঁর মেজাজের অনেকটাই লোক দেখানো।"

"তুমি কিছুই মানুষ চেনো না। উনি ঘ্যাম চাকরি করেছেন, মেলামেশার জগৎটাও ছিল হাইফাই...এখন তো আর সেসব নেই, তাই এক ধরনের জ্বালাও এঁদের মধ্যে কাজ করে।"

রূপসার কথা পুরোপুরি মানতে পারল না সম্পূর্ণা। তবে আর বাদানুবাদে গেল না। লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুল ভাল করে। নাইটি গলিয়ে আবার ফিরেছে বিছানায়। ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে চালু করল। টকটক টিপল বাবার নাম্বার। ফোনে কথা শেষ হতে না-হতেই প্রতিমা হাজির। চা আর চিঁড়েভাজা নিয়ে। রূপসাকে প্লেট এগিয়ে দিল সম্পূর্ণা। নিল না রূপসা। সে আগেই খেয়েছে।

তখনই সম্পূর্ণার মোবাইলে টুং ধ্বনি। এসএমএস এল। এই নাও, ওই নাও, কত যে হাবিজাবি আসে সারাদিন। অবহেলাভরে সম্পূর্ণা দেখল সংক্ষিপ্ত বার্তাটা। সঙ্গে সঙ্গে চাবুক খেল যেন। চিনুদা! কী ভয়ঙ্কর আবদার, 'তোর কলেজে আসব, কবে, কখন, জানা!'

সম্পূর্ণার নির্জীব মস্তিষ্কে সহসা আগুন ধরে গেল যেন। হঠাৎ এসব কী শুরু করল চিনুদা? একটু শান্তিতে লেখাপড়া করতে চাইছে, দেবে না কিছুতেই? চুপ থাকলে আরও যেন পেয়ে বসছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে বিড়ালের নখও ঝলসে ওঠে। সম্পূর্ণা আজ কথাটা বুঝিয়ে ছাড়বে।

মোবাইল হাতে সম্পূর্ণা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বসার ঘরে কেউ নেই, সটান চলে গেল ব্যালকনিতে। নাম্বারটা টিপতেই ওপারে চিরন্তনের গলা, "হেরে গেলি তো? ফোন করলি তো শেষমেশ?"

সম্পূর্ণা বিনা ভূমিকায় বলল, "তুমি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ চিনুদা! খুঁজে-খুঁজে আমার শ্যামবাজারের হস্টেলে হানা দিলে। এখন কলেজে আসতে চাইছ। তোমার ধান্দাটা কী?"

"আমি তো শুধু তোকেই চাই রে পুন্যি। সেই আগের মতো করে।"

"ছিঃ, আমি তোমাকে ঘেন্না করি, ঘেন্না করি, ঘেন্না করি!"

"ও কথা বলিস না পুন্যি। তোর মুখে মানায় না। আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর তুই যতদিন বর্ধমানে পড়েছিস, আমি কি তোকে ডিস্টার্ব করেছি? কেন করিনি? তোকে ভালবাসি বলেই তো। তুই এখন কলকাতায়। এবার তো ফের আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে। পারে কিনা বল?"

"তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! আমাকে ফাঁসিয়ে তুমি নিজের চামড়া বাঁচাও। এখন ভালবাসার কথা বলছ?" সম্পূর্ণা হিসহিস করে উঠল, "ক্ষমতা থাকলে আমি তোমার জিভ ছিঁড়ে নিতাম।"

"অত তেজ দেখাস না। তুই এখনও জানিস না, আমি কী!"

"ওসব ভয় তুমি অন্য কাউকে দেখিও। আমি আর সেই পুন্যি নেই। তুমি সায়েন্স কলেজের ত্রিসীমানা মাড়ালে আমার ক্লাসমেটদের দিয়ে তোমার হাড় গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ছাড়ব।"

"সেই পুরনো সুন্দর দিনগুলোর কথা একেবারেই ভুলে গেলি রে পুন্যি?"

"ও কথা একদম তুলবে না। আমি মোহে পড়ে গিয়েছিলাম। বললাম তো, এখন তোমায় ঘেন্না করি। কখনও আর আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে না!" জবাবে ওপার কী বলল শোনার তোয়াক্কা করল না সম্পূর্ণা। ফোন কেটে দিয়ে হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক।

আচমকা ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে সংকেত। ঝট করে ঘুরল সম্পূর্ণা। অমনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। অদূরে করবী। সম্পূর্ণার কথাগুলো শুনতে পেয়েছে নাকি?

সর্বনাশ, কী হবে এখন!

এবছর অনেকটাই দেরিতে এসেছে শরৎ। গোটা ভাদ্রমাসটা তো বটেই, আশ্বিনেও কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! একদিন নীলের দেখা মিলল কি মিলল না, অমনি তিনদিন আকাশের মুখ ভার। অবশেষে, মহালয়ার প্রায় মুখে মুখে, বিদায় নিল বর্ষা। সাদা-সাদা মেঘে এখন পুজো-পুজো গন্ধ। বিধাননগরের আনাচে-কানাচে দোল খাচ্ছে কাশফুল।

ইদানীং মেজাজটাও খানিক ফিরেছে অনুব্রতর। তার আপত্তির পরোয়া না করে বাড়িতে দুটো বাইরের মেয়েকে ঢোকানোয় যে-বিরক্তিটা ঠিকরে বেরোত, তা যেন অনেকটা স্তিমিত এখন। তার মানে কিন্তু এই নয়, করবীর কাজটাকে সে মন থেকে মেনে নিয়েছে। মনের সঙ্গে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে মাত্র। করবী যদি বুড়ো বয়সে পুতুল খেলে আনন্দ পায়, পুতুলদের খাইয়ে-দাইয়ে নাড়াচাড়া করে তার চিত্ত প্রফুল্ল থাকে, অনুব্রত কেন তাতে ব্যাগড়া দিয়ে গৃহশান্তি ঘোচাবে! শুধু নিজেকে সে খানিক তফাতে সরিয়ে রেখেছে। পারতপক্ষে রূপসা, সম্পূর্ণার প্রসঙ্গ তোলে না। সেই যে রূপসা মেয়েটা ড্যাঙডেঙিয়ে বন্যাত্রাণ না ছাতার মাথায় গেল, তখন থেকেই অনুব্রতর মুখে কুলুপ। রবিবার বলে মেয়েটা যে মঙ্গলবার ফিরল, তা নিয়েও

শব্দটি নেই। কেনই বা অযাচিত মন্তব্য করে খোঁচা খাবে করবীর! অবশ্য করবীই তাকে নিজে থেকে বলল, রূপসা নাকি ফোনে জানিয়েছিল সে একবার বাড়ি ঘুরে আসবে। ঘাটাল থেকে বহরমপুর যে মোটেই সোজা রাস্তা নয়, মেয়েটা সেখানে আদৌ গেল, না দু' দিন কোথাও ফুর্তি মেরে এল, সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার জন্য একবার মেয়েটার বাবাকে ফোন করা উচিত, কথাগুলো মাথায় উঁকি দিলেও ভুলেও অনুব্রত কোনও পরামর্শ দেয়নি করবীকে। যার ম্যাও, সে সামলাক!

তা বলে অনুব্রত একদম চোখকান বন্ধ করেও বসে নেই। সব লক্ষ রাখছে সে, সব। রূপসা তো অর্ধেক দিন বেলা অবধি গড়াগড়ি খেয়ে বারোটার পর বেরোয়, কোনও-কোনও দিন দুটো-আড়াইটেয়। অত দেরিতে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে কী করে? আদৌ যায় কিনা, কে জানে! ফেরে কিন্তু আটটা-ন'টা বাজিয়ে। সন্ধেবেলা কী এমন কাজ থাকে রোজ? মানুষ চরিয়ে-চরিয়ে চুল পাকিয়ে ফেলেছে অনুব্রত, রূপসা যে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে বই খুলে বসে থাকে না, এ অনুব্রত হলফ করে বলতে পারে। দুপুরের খানাটিও তো আজকাল জুটে যাচ্ছে মাসিমার কল্যাণে! করবী যদিও বলে, সে নাকি আলাদা করে মিল চার্জ দিয়ে দেয়। অনুব্রতকে শোনানোর জন্য বলে হয়তো। আদৌ সে দেয় কিনা, ঘোর সন্দেহ।

সম্পূর্ণা মেয়েটির অবশ্য বেচালপনা কম। পড়ুয়া টাইপ। অনেকটা ছোটুর মতো। পড়াশোনার বাইরে আর কিছুতে মাথা ঘামায় বলে তো মনে হয় না। তবে সেও তো একদিন চমকে দিয়েছিল অনুব্রতকে। ইদানীং প্রস্টেটের সমস্যা হচ্ছে, রাতে এক-দু'বার বাথরুমে যেতে হয়। সেদিন খুব তেষ্টা পাচ্ছিল, বাথরুম ঘুরে ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল খেতে গিয়েছিল অনুব্রত। হঠাৎ মনে হল, কে যেন দাঁড়িয়ে ব্যালকনিতে! পা টিপে-টিপে বসার ঘরে গিয়ে দেখে সত্যিই তাই! রেলিং ধরে ঝুঁকে থাকা প্রাণীটি সম্পূর্ণাই বটে। টেরই পায়নি অনুব্রতর উপস্থিতি, এতই বেহুঁশ। রাত তিনটের সময় ওই বয়সের একটা মেয়ের ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তো আদৌ সুলক্ষণ নয়! একমাত্র প্রেমে হাবুডুবু খেলেই বুঝি এটা সম্ভব। বায়ু চড়ে যায় কিনা!

কথাটা পরদিন করবীকে জানিয়েছিল অনুব্রত। বলব না, বলব না করেও। তা করবী তেমন আমল দিল কই! বরং হালকাভাবে ভাসিয়ে দিল, অনুব্রতর নাকি ওসব নিয়ে মাথা না ঘামালেই ভাল। এর পর তো অনুব্রতর উদাসীন হয়ে থাকাটাই সঙ্গত। নয় কি? শুধু খাও দাও, ঘরের ডিউটি কর, ঘুমোও...

আজও দুপুরে ঘুমোচ্ছিল অনুব্রত। সুখনিদ্রাটি ভাঙল প্রতিমার ডাকে, "মামা, আপনার চা।"

অনুব্রত সাইড টেবিল থেকে চশমাটা নিয়ে চোখে চড়াল। সময় দেখল দেওয়ালঘড়িতে। পৌনে পাঁচটা। কাপ হাতে তুলে বলল, "এত দেরি করলি কেন?"

"আপনি আজ অনেক পরে শুলেন তো।"

তা ঠিক। দুপুরে আজ অনুব্রত টিভিতে জমে গিয়েছিল বটে। সরকারি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোর একটা হল্লাগুল্লা শুরু হয়েছে দিল্লিতে! রামলীলা ময়দানে মঞ্চ বানিয়ে গরম-গরম বক্তৃতা দিচ্ছিল কয়েকজন, পুলিশ গিয়ে পিটিয়েছে তাদের, তাই নিয়ে তুমুল শোরগোল। দেখতে ভারী মজা লাগছিল অনুব্রতর। যে-দেশে রাজা থেকে ভিখিরি, সকলে গলা অবধি দুর্নীতির পাঁকে ডুবে, সেখানে এই আন্দোলন-আন্দোলন খেলাই তো সেরা বিনোদন। যারা চেল্লাচ্ছে, তাদের ধরে গদিতে বসিয়ে দিলে, তেনারা যে কী করবেন, ভাবলেই অনুব্রতর পেট গুলিয়ে হাসি উঠে আসে। ডিভিসি-তে থাকার সময়ে তো দেখেছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কত টাকা খাওয়া চলে। অনুব্রত ব্যাপারটায় পেরে ওঠেনি। সেটা তার গুণ না দোষ কে জানে! চোর হওয়ার মতো বুকের পাটা ছিল না বলেই হয়তো সাধুপুরুষ হয়ে গেছে সে। শুধু কষ্ট করে চোখ দু' খানা বুজে থাকতে হয়েছে, এই যা!

করবী ঘরে ঢুকেছে। ওয়ার্ড্রোবের দিকে যেতে-যেতে বলল, "আর লেট কোরো না। চা খেয়ে এবার তৈরি হয়ে নাও।"

"আগে তুমি রেডি হও।"

"চুল তো বেঁধেই নিয়েছি। আর তো শুধু শাড়ি পরা," করবী পাতলা হাসল, "সময় তো তোমারই লাগবে। পুজোর আগে শ্বশুরবাড়িতে দিতে-থুতে যাচ্ছ, জামাই মানুষ, একটু সাজুগুজু না করে গেলে চলে!"

অনুব্রত ঠোঁট বেঁকাল, "হ্যাঁ, নতুন জামাই বলে কথা! আমাদের বিয়ের পঞ্চাশ পূর্তির যেন আর কত বাকি?"

"আমার অত হিসেব নেই। শুধু মনে আছে, পাক্কা তিন বছর পর রাজা হয়েছিল। সেই রাজার এখন উনচল্লিশ পেরিয়ে চল্লিশ।"

"তুমি তো প্রতিমার মতো করে বলছ গো। সেই যে বছর ক্যানিংয়ে বড় ঝড়টা হল..." বলতে-বলতে হেসে ফেলল অনুব্রত। একটু যেন দূরমনস্কও সহসা। কী তীব্র গতিতে যে কেটে গেল জীবনটা! এই তো সেদিন চাকরিতে ঢুকল। চন্দ্রপুরায় জয়েন করে ফ্যালফ্যাল চোখে পেল্লাই বয়লারগুলো দেখছিল। তারপর একদিন বাবা খবর দিল, তোমার জন্য মেয়ে পছন্দ করা হয়েছে, এসে দেখে যাও। পাত্রী দেখতে যায়নি অনুব্রত, স্টুডিওয় তোলা করবীর ফটোগ্রাফটি অবলোকন করেই সম্মতি জানিয়েছিল বিয়েতে। তাদের হরতুকিবাগানের ভাড়াবাড়ি থেকে করবীদের শ্যামপুকুর কতটুকুই বা পথ, বিয়ের দিন ওইটুকু যেতেই অনুব্রত ঘেমেনেয়ে একসা! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক সহপাঠী ছিল গাড়িতে। স্বদেশ। পিঠে চাপড় মেরে সে অবিরাম সাহস জোগাচ্ছিল অনুব্রতকে, তাও...তারপর বরণ শঙ্খধ্বনি, মেয়েদের উলু, সাত পাকে ঘোরা, বাসরঘর, সব যেন কেমন ঘোরের মতো। বাসরে গান গেয়েছিল করবী, 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে...' মাঝে এতগুলো বছর...কেমন হুশ করে কেটে গেল সময়টা!

অনুব্রত বিড়বিড় করে বলল, "ভাবা যায় না।"

করবী ঠিক শুনতে পেয়েছে। জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবা যায় না?"

"কিছু না!" সাইড টেবিলে কাপ-ডিশ রখে অনুব্রত খাট থেকে নামল। শাড়ি বের করে পরছে করবী, তাকে দেখতে-দেখতে বলল, "তুমি আজকাল আর গান গাও না।"

"হঠাৎ একথা?"

"নাঃ, এমনই মনে হল। এককালে তুমি বেশ গাইতে তো!"

"সে তো আমি ভাল নাচতেও পারতাম। বিয়ের আগে মহাজাতি সদনে নৃত্যনাট্য করেছি। তুমি তো খবরের কাগজের কাটিংও দেখেছ। তা বলে এখনও কি তা-তা থই-থই করতে পারব?"

"গুণগুলো কিন্তু তোমার এক্সপ্লোর করা উচিত ছিল।"

"ঢং কোরো না। দুই ছেলে সামলাতেই জীবন চলে গেল! কী ভাবে রাজা, ছোটু বড় হল, তুমি তো টেরই পেলে না! উদয়াস্ত ওদের পিছনে সময় ব্যয় করতে গিয়ে নাচগানের শখ কোথায় যে পালিয়ে গেছে!"

কথাটার বুঝি একটা সূক্ষ্ম খোঁচা আছে। অনুব্রতকে লক্ষ্য করে। করবী সর্বদাই প্রতিপন্ন করতে চায়, রাজা-ছোটুর জন্য ও একাই শুধু প্রাণপাত করেছে। অনুব্রতরও যে তাতে একটা বড়সড় ভূমিকা ছিল, ভুলে যায় করবী। হয়তো করবীর মতো ততটা সঙ্গ দিতে পারেনি ছেলেদের, নিত্যদিনের প্রয়োজনে ততটা লাগায়নি, তবু অনুব্রতও তো করেছে তার সাধ্যমতো। চন্দ্রপুরা থেকে দুর্গাপুরে এল, তারপর হঠাৎ বদলি হয়ে মেজিয়ায়। পাছে ছেলেদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়, করবী আর রাজা ছোটুকে হরতকিবাগানের বাড়িতে রেখে একা মেজিয়ায় গিয়ে থাকেনি সে? এক-দু'মাস নয়, টানা পাঁচ-পাঁচটা বছর! সংসারী মানুষের একা থাকার অসুবিধেগুলো সে তখন মানিয়ে নিয়েছিল তো। কেন? ভবিষ্যতে কোনও একদিন তারা সকলে মিলে একত্রে একটা নিটোল সংসারে বাস করবে, এমন একটা স্বপ্ন চোখে ছিল বলেই না! স্বপ্নপূরণ কি হল আদৌ? তবু কেন যে করবী নিজেকে একা দুঃখী ভেবে হা-হুতাশ করে?

অনুব্রত অবশ্য ওসব প্রসঙ্গে গেল না। হালকা মেজাজে বলল, "আবার শুরু করে দাও। নাচতে হয়তো পারবে না, গানই সই।"

"খেপেছ? গলা দিয়ে এখন যা সুর বেরবে, কাক-চিল না পালায়!" করবী হাসছে, "আজেবাজে কথা রাখো তো। দিন ক্রমশ ছোট হচ্ছে, শ্যামপুকুর পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে।"

অগত্যা গা ঝাড়া দিতেই হয়। প্যান্ট-শার্টেই সে বেশি স্বচ্ছন্দ, তবে আজ পাজামা-পাঞ্জাবি পরল অনুব্রত। গাড়ির চাবি নিয়ে নামল নীচে। গ্যারাজ খুলল। পুরনো ঢাউস গাড়িখানা বেচে বছরসাতেক হল একটা ছোট সিডান কিনেছে। ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিল, ব্যাঙ্কট্যাঙ্ক ছাড়া এদিক-ওদিক যেতে হলে নিজেই গাড়িটা নিয়ে বেরয়। তেল সার্ভিস এখনও ভালই। অবশ্য যত্নআত্তি করতে হয় নিয়মিত।

গাড়ি রাস্তায় বের করে ফেদার ডাস্টার দিয়ে ধুলো ঝাড়ছিল অনুব্রত। করবী নামল। হাতে খানতিনেক প্লাস্টিকের প্যাকেট। সাজের ফিনিশিং টাচটা বেশ ভালই দিয়েছে করবী। কপালে একখানা চাকা টিপে ভারী ভরভরন্ত দেখাচ্ছে মুখখানা।

করবীকে পাশে বসিয়ে অনুব্রত স্টার্ট দিল গাড়িতে। মোড়টাও পেরোয়নি, করবী বলে উঠল, "এঃ, একটা ভুল হয়ে গেল তো!"

"কিছু ফেলে এসেছ বুঝি?"

"না, না। মেয়েদুটো যদি এখন আসে, প্রতিমা কী জলখাবার দেবে..."

"টেনশন করছ কেন? প্রতিমা যথেষ্ট ওস্তাদ, ঠিক ম্যানেজ করে নেবে।"

"তবু... রূপসা কাল সকালে বহরমপুর যাবে..."

তাই কি আজ বাড়তি খাতির? দেবীপক্ষের চতুর্থী স্পেশাল? মনে এলেও বাক্য দুটো গিলে নিল অনুব্রত। জিজ্ঞেস করল, "আর তোমার ছোট কন্যেটি কবে পুজোর ছুটিতে যাচ্ছে?"

"পরশু। ষষ্ঠীর সকালে। সম্পূর্ণার বাবা আসবে নিতে। জানো তো, ওদের ছুটি এখন খুব কম। লক্ষ্মীপুজোর পরই দু'জনের ইউনিভার্সিটি খুলে যাবে।"

"অর্থাৎ দিনদশেকের বিরতি। তারপরই বাড়ি ফের সরগরম।"

"এই কটা দিন বাড়ি কিন্তু খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে।"

"বড্ড বেশি মায়া বাড়িয়ে ফেলছ করবী। চেক করো, চেক করো।"

"মায়ার বাঁধনে আটকে পড়া ঠিক নয়। ছিঁড়তে বড্ড কষ্ট হয়!" স্বগতোক্তির মতো বলল করবী। কিন্তু কথাটা যেন ছড়িয়ে গেল বাতাসে। একটু যেন গুমোট হয়ে গেল গাড়ির অন্দর। মুখে আর শব্দটি নেই স্বামী-স্ত্রী'র। অনুব্রত গাড়ি চালাচ্ছে নীরবে। পথঘাটে যত্রতত্র প্যান্ডেল, ঠাকুর দেখার ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে বাঁশ বাঁধা হয়েছে ফুটপাথে, আলোর রোশনাইয়ে ঝলমল করছে শহর। আজই কত লোক, যেন শুরু হয়ে গেছে পুজো।

ট্রাফিক জ্যামে আটকেছে গাড়ি। আর নড়ছেই না। অনুব্রত বিরক্ত মুখে বলল, এখন রাস্তায় বেরনোর কোনও মানে হয়? একবারে বিজয়ার পর গেলে পারতে। এক ঢিলে দুই পাখি মেরে আসা যেত।

"যাঃ, তা হয় নাকি? পুজোর জামাকাপড় পুজোর পর দেব?"

"যত্ত সব জোলো সেন্টিমেন্ট! তুমি ওদের কিছু দেবে, ওরাও আমাদের রিটার্ন দেবে, বাৎসরিক এই দেওয়া-নেওয়ার খেলাটা ক'দিন আগে পরে হলে কী এসে যায়?"

"তুমি তো বলবেই। তোমার তো ওসবের বালাই নেই।"

অনুব্রত হুলটা তেমন গায়ে মাখল না। তারা চার ভাইবোন, বড়দা বছরতিনেক আগে কিডনির অসুখে মারা গেছে, দিদি থাকে কল্যাণী, ছোট ভাই বজবজ। যোগাযোগ আছে বটে, তবে বেশিটাই ফোনে-ফোনে। বাবা-মা চলে যাওয়ার পর থেকে সুতোগুলো যেন অনেক ঢিলে হয়ে গেছে। ভাইবোনদের মধ্যে দেওয়া থোওয়ার চলও আর নেই। বাতের ব্যথায় প্রায় পঙ্গু দিদি তবু ডাকে ভাইফোঁটায়। যাওয়া হয় না প্রতি বছর। তবে গেলে বড় খুশি হয়। তখন নিয়মরক্ষের মতো কিছু একটা হাতে করে নিয়ে যায়। পৃথিবীতে সবাই যার-যার তার-তার। রাজা-ছোট্টর আর আলাদা করে কী দোষ!

যানজটে ঠেলে শ্যামপুকুর পৌঁছতে প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে গেল। সরু গলিতে গাড়ি রাখাও এক হাঙ্গামা। মুড়ি-মিছরির মতো গাড়ি কিনছে লোকে, পথই গ্যারাজ। সেখানে উটকো যানের ঠাঁই মেলা মুশকিল। তার উপর পাশেই একটা পুজো, তারাও অনেকটা জায়গা খেয়ে নিয়েছে। করবীর বাপের বাড়ির থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাড়ি রাখতে হল অনুব্রতকে। অতঃপর গাড়ি লক করে পায়ে হাঁটা।

পুরনো দোতলা বাড়ির একতলায় বেল টিপতেই দরজা খুলেছে স্নিগ্ধা। গোলগাল গিন্নিবান্নি মুখে খুশি উঠলে উঠল, "এত দেরি করলে যে তোমরা?"

"মাঝরাতের আগে পৌঁছেছি, এই না ঢের!" অনুব্রত মন্তব্য ছুঁড়ল, "নেক্সট টাইম এবাড়ি এলে গাড়ি আর নৈব নৈব চ।"

"বুঝেছি, জামাইবাবুর খুব পরিশ্রম হয়েছে। বসুন, একটু সরবত করে আনি।"

বাইরের ঘরটি রীতিমতো বড়সড়। পুরনো আসবাবে সাজানো-গোছানো। অনুব্রত আদ্যিকালের সোফায় বসল। করবী ঢুকে গেল ভিতরে। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

গ্লাস হাতে ফিরেছে স্নিগ্ধা। পিছনে কাঞ্চন। ঠাট্টার সুরে বউকে বলল, "সন্ধেবেলা জামাইবাবুকে শুধু লেবুর রস দিচ্ছ?"

অনুব্রতও রসিকতা করে উত্তর দিল, "যে-দ্রব্যটি পেলে গাড়ি চালানোর ধকলটা কাটত, সেটা তো তুমি রাখ না ভায়া। দু' চুমুক হুইস্কি মারলে শরীরটা তরতাজা হয়ে যেত।"

"হা, হা!" ষাট পেরনো বেঁটেখাটো কাঞ্চন বসেছে অনুব্রতর মুখোমুখি। অনুযোগের ভঙ্গিতে বলল, "এই বয়সে কেন অযথা স্ট্রেস নিচ্ছেন? একটা ড্রাইভার রাখলে তো পারেন।"

"হ্যাঃ, রিটায়ার্ড মানুষ ড্রাইভার পুষবে!"

"ওকথা বলবেন না জামাইবাবু। অমন ঘ্যামচ্যাক বাড়ি, একতলা লিজ, মোটা পেনশন, দু'-দুটো জুয়েল ছেলে, আপনার আবার কীসের অভাব? তার উপর এখন পেয়িং গেস্ট বসিয়েছেন, তার কাছ থেকেও দু'-চার পয়সা আসছে," কাঞ্চন চোখ টিপল, "আপনার পয়সা খাবে কে বলুন তো?"

নিছকই মজা করে বলছে কাঞ্চন। তাও অনুব্রতর গা চিড়বিড়িয়ে উঠল। বিশেষ করে পেয়িং গেস্টের প্রসঙ্গটি তার একেবারেই না-পসন্দ। দেঁতো হেসে বলল, "পাঁচ ভূতের পেটে যাবে বোধ হয়!"

টুকটাক রঙ্গরসিকতা চলছে শালা-জামাইবাবুর। ব্যাঙ্কে চাকরি করত কাঞ্চন। বছর দুয়েক হল অবসর নিয়ে আবার কোথায় পার্টটাইম ধরেছে। সঞ্চয় তারও নেহাত কম নয়। ফ্ল্যাট-ট্যাট কেনার চক্করে যায়নি, আদ্যিকালের বাড়িতে নামমাত্র ভাড়ায় দিব্যি রইসি চালে থাকে। যা গলির ভিতর বাড়ি, প্রোমোটার ছুঁয়েও দেখবে না কখনও! মায়ের পিছনেও বিস্তর খরচাপাতি করে কাঞ্চন। ডাক্তারবদ্যি ওষুধ তো আছেই, তার ওপর দু'খানা আয়াও রেখে দিয়েছে। হয়তো একটু চাপ পড়ে, কিন্তু মুখ ফুটে দিদি-জামাইবাবুকে কাঞ্চন কিছু বলে না। মায়ের খরচ ভাগ করার কথা করবী বলেছে বারকয়েক, কাঞ্চন এড়িয়ে গেছে। সম্ভবত 'ভাগের মা' শব্দবন্ধটিতে তার আস্থা নেই। কিংবা শব্দটিকেই সে ভয় পায়।

শেফালি আসছে ঘরে। তার হাত একদিক থেকে ধরে আছে আয়া, অন্যদিকে করবী। নড়বড়ে পায়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। ঘোলাটে চোখ নিরীক্ষণ করছে অনুব্রতকে। কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি ভাল আছ?"

মুখে জবাব দিয়ে লাভ নেই। শুনতে পাবে না। অনুব্রত বড় করে ঘাড় হেলাল।

"আমিও ভাল আছি। রুমু আমায় কমপ্ল্যান কিনে দিয়ে গেছে।"

অনুব্রত চেঁচিয়ে বলল, "খুব ভাল। রোজ দু'বেলা খান। শরীরে জোর পাবেন।"

"ঝুমুও দিয়ে যায়। কেক, চকোলেট, ক্রিম বিস্কুট।"

"শুনছ তো নাতনিদের প্রশংসা?" স্নিগ্ধা গর্বিত গলায় করবীকে বলল, "আর আমি যে সারাদিন ওঁর হ্যাপা সামলাই, সেকথা মা কখনও বলেন না।"

"তুমি তো করোই," করবী হেসে বলল, "রুমু-ঝুমুও যে বিয়ের পর ঠাম্মা ঠাম্মা করে, এ তো কম কথা নয়।"

"তা আছে কেমন মেয়ে দুটো? অনুব্রত জিজ্ঞেস করল, "পুজোর সময়ে আসছে বাপের বাড়ি?"

"তারা তো সব সময়েই আসছে," কাঞ্চনের গলাতে গর্বিত পিতার ভাব, "অফিসফেরত সপ্তাহে এক-আধদিন তো ঢুঁ মারেই। পুজোতেও নিশ্চয়ই..."

কথার মাঝে হঠাৎই ছন্দপতন। স্বর বেজে উঠেছে শেফালির, "তোমরা হাতে করে কিছু আনলে না যে বড়?"

লজ্জায় অনুব্রতর মাথা কাটা যাওয়ার জোগাড়। সর্বদাই তো মিষ্টি-ফিস্টি কিছু নিয়ে ঢোকে এবাড়িতে। আজই কিনা বেমালুম ভুলে গেল? করবীরও কী আক্কেল, একবার মনে করিয়ে দেবে তো! মহিলারও ক্ষুরে-ক্ষুরে দণ্ডবৎ! কে বলে ছিয়াশি বছরের শাশুড়ি ঠাকুরুনটির মগজে মরচে ধরেছে?

করবীই বুদ্ধি করে সামাল দিল। সোফায় রাখা প্লাস্টিকের প্যাকেট তুলে বলল, "কে বলে কিছু আনিনি? এই তো।"

শেফালির চোখ পিটপিট, "ওটা কী?"

"তোমার নতুন ড্রেস। পুজোয় পরবে।"

সাদার উপর প্রিন্ট নাইটি জোড়া বের করে মেলে ধরল করবী। শেফালি ভারি খুশি। দেখছে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে।

কাঞ্চন মুচকি হেসে বলল, "তোর কপাল খুলল রে দিদি! এখন যে আসবে, তাকে নাইটির গল্প শোনাবে।"

করবীও তা জানে, হাসছে। আড্ডা-হাসির মাঝেই সারা হল পোশাক বিনিময় পর্ব। কাঞ্চন পেল দামি ব্র্যান্ডের শার্ট, স্নিগ্ধা মন্দির-মন্দির পাড় সাউথ কটন শাড়ি। আর এক সেট পাজামা-পাঞ্জাবি হল অনুব্রতর। করবীরও বুটি-বুটি তাঁতবস্ত্র বাড়ল একখানা। চিকেন কাটলেট এনে রেখেছিল কাঞ্চন। মোড়ের মিষ্টি দোকানের লোভনীয় রসমালাইও। খেয়ে পেট ঢাক! এবার ওঠার পালা।

পথেঘাটে ভিড় এখন চতুর্গুণ। শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে গাড়ি। অনবরত ক্লাচ ব্রেক করতে করতে অনুব্রতর হাঁটু টনটন। বাইরে ঢাক আর কলরোলে কানের পর্দার থর-থর দশা।

তার মধ্যেই করবী বলল, "মা একদম ছেলেমানুষ হয়ে গেছে।"

"স্বাভাবিক," অনুব্রতর স্বরে গোপন শ্লেষ, "তোমরা সবাই যা প্যাম্পার করো।"

"সে তুমি যাই বলো, মার ভাগ্যটা একবার ভাব। ছেলে-মেয়ে, বউ, নাতনি, সকলের অ্যাটেনশন পাচ্ছে। সবাই সাধ্যমতো মায়ের জন্য কিছু করছে," করবী ম্লান হাসল, "আমাদের যে ওই বয়সে কী হাল হবে!"

"আগে ওই বয়সে পৌঁছও তো, তখন ভাববে।"

"তখন কি ভাবাভাবির ক্ষমতা থাকবে? এটুকু এখনই বুঝছি, ওসব সেবা-টেবা আমাদের কপালে নেই।"

"থাকার দরকারটা কী? কেন অন্যের ওপর ডিপেন্ড করব? ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, এটাই দুনিয়ার সেরা প্রিন্সিপাল...কড়ি থাকাটাই বেশি জরুরি, বুঝলে? আসলি সার্ভিস টাকাই দেয়!"

"বলা খুব সোজা স্যার। মায়ের মতো দশা হলে টাকাকড়ির কী মূল্য।"

"ওরকম সিচুয়েশন হবে কেন? তার আগে পুট করে মরে যাব, দেখে নিও।"

"হুঁঃ, চাইলেই যেন সব হয়! কার কপালে দ' হয়ে পড়ে থাকা নাচছে, কে

বলতে পারে?"

অনুব্রত চুপ করে গেল। এই ভাবনাটাকে সে কোনওভাবেই মনে ঠাঁই দিতে চায় না। করবী কেন যে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে স্মরণ করায়! সত্যি কি করবী ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় পায়? নাকি বোঝাতে চায় অনুব্রতকে? বাকি রাস্তাটা চুপচাপই কাটল। সল্টলেকে ঢোকার পর গতি বেড়েছে গাড়ির। বাড়িতে পৌঁছে নিশ্চিন্ত।

করবী প্যাকেট-ম্যাকেট নিয়ে ভিতরে চলে গেছে। গ্যারাজে গাড়ি ঢুকিয়ে শাটার নামাচ্ছিল অনুব্রত। একতলার তামিল ব্যাঙ্ক অফিসারটি বাড়িতে ফিরছে। অনুব্রতকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল, "গুড ইভনিং মিস্টার মৈত্র। হ্যাপি দুর্গাপুজা।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।"

"একটা রিকোয়েস্ট ছিল। ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বলল রঙ্গনাথন, "একটা বাথরুমের সিস্টার্ন ইজ নট ওয়ার্কিং। কাইন্ডলি প্লাম্বারকে যদি একবার কল দান..."

"দেখছি। পুজোর মুখ তো, এখন ওদের ধরা। হয়তো দেশে পালিয়েছে। আই মিন, ওড়িশায়।"

"আমার কিন্তু খুব প্রবলেম হচ্ছে স্যার। আমার মিসেস আজই গিয়ে বলবে ভাবছিল।"

"বললাম তো, দেখছি।"

অনুব্রত সরে এল। বাড়িঘর থাকার হাজারো হ্যাপা। আজ এটা সারাও, কাল ওটা মেরামত করো, ট্যাঙ্ক সাফা রাখো। এখন কোথায় প্লাম্বার খুঁজে বেড়াবে? রঙ্গনাথনেরও বলিহারি! থাকে তো দেবাদেবী, একমাত্র ছেলে হায়দরাবাদে পড়ছে, তিন-তিনখানা বাথরুমের একটা যদি গড়বড় করেই, কী এসে যায়? হালকা-হালকা বিরক্তি নিয়ে অনুব্রত উঠল দোতলায়। করবী ধারেকাছে নেই। দুই কন্যের দরজা খোলা, অর্থাৎ সেখানে গিয়েই ভিড়েছে। হুঁঃ, কীসের যে এত টান!

পোশাক বদলে বসার ঘরে এসে টিভি চালিয়ে দিল অনুব্রত। প্রতিমা বোধহয় এতক্ষণ টিভি দেখছিল, একটি বিনোদনের চ্যানেল ফুটেছে পর্দায়। ঘুরিয়ে খবরে ঢুকে পড়ল। এখনও সেই দিল্লি নিয়েই চলছে তুলকালাম। প্রতিমা বোতল আর গ্লাস রেখে গেল। সঙ্গে কাচের বাটিতে বরফের টুকরো। প্লেটে বাদামভাজাও।

গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে-ঢালতে অনুব্রত হেসে ফেলল। খাবে তো এক-দু' পেগ, তার আবার এত আয়োজন! তবু এই ব্যবস্থাটি না থাকলে যেন মন ওঠে না, সন্ধেটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। আজ অবশ্য দু'পেগেই উঠবে। গোবদা কাটলেটখানা গজগজ করছে পেটে, অম্বল হয়ে যেতে পারে।

আয়েসী ভঙ্গিতে গ্লাস হাতে তুলে টিভি-র কাজিয়ায় চোখ রেখেছে অনুব্রত, অমনই ল্যান্ডলাইন ঝনঝন।

গ্লাস রেখে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল অনুব্রত, "হ্যালো?"

"আপনার বেয়াই বলছি, রঞ্জিত। শুভ সন্ধ্যা।"

"ভেরি-ভেরি শুভ সন্ধ্যা," ছোটুর শ্বশুরের গলা পেয়ে অনুব্রত একটু নড়ে বসল, "তা আছেন কেমন?"

"ক'দিন সর্দিজ্বর মতো হয়েছিল। এখন ফার্স্ট ক্লাস!" রঞ্জিতের গলায় বেশ ফুর্তি-ফুর্তি ভাব, "এদিকে তো একটা কাণ্ড হয়েছে।"

"কী হল?"

"আমার কন্যাটি, মানে, আপনার ছোট বউমা জব্বর এক সারপ্রাইজ দিয়েছে!"

"তাই নাকি? কীরকম?"

"আজ বিকেলের ফ্লাইটে হঠাৎ পুচকুনকে নিয়ে হাজির!"

অনুব্রত জোর নাড়া খেয়ে গেল! শ্রাবন্তী এসেছে? বাপের বাড়িতে? অনুব্রতদের না জানিয়ে?

অনুব্রত গলা দিয়ে শুধু বেরল, "ও..."

রঞ্জিত আহ্লাদিত স্বরে বলল, "নিন, ধরুন। আপনার বউমা পাশে দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলুন।"

মাঝে কয়েকটা সেকেন্ড। এবার ওপ্রান্তে শ্রাবন্তীর রিনরিনে কণ্ঠ, "হ্যাঁ বাবা, দুম করে চলে এলাম। আপনি কেমন আছেন?"

"ভাল।"

"মা?"

"আমরা সবাই ভাল," অনুব্রতর গলা একটু ভারী হল, "ছোটুর মা'র মুখে শুনছিলাম, এবছর নাকি কলকাতায় আসবে না?"

"সেরকমই তো প্ল্যান ছিল। হঠাৎ ইচ্ছে হল। আমার আর পুচকুনের তো এখন নবরাত্রির ছুটি চলছে, পুচকুনটাও খুব বায়না ধরল..."

"অ। তা আছ ক'দিন?"

"দশমীতে ফিরে যাব। সপ্তমীর সকালে আমি সল্টলেকে যাচ্ছি। ওদিন হোল ডে আপনাদের সঙ্গে কাটিয়ে আসব।"

"ও, তোমার শাশুড়িকে ডাকব? কথা বলবে?"

"থাক, পরে ফোন করব'খন।"

শ্রাবন্তী যখন কথা বলছিল, ঢাকের বাদ্যি শুনতে পাচ্ছিল অনুব্রত। ফোন রাখার পরেও বাজনাটা যেন রয়ে গেছে কানে। উঁহু, কানে নয়, বুকে। শ্রাবন্তী কলকাতায় এসে একবার সল্টলেক না ছুঁয়ে সোজা টালিগঞ্জ চলে গেছে, এটা কেন যে অনুব্রত মানতে পারছে না? শ্রাবন্তীর কোনটা চমক? হঠাৎ কলকাতায় আগমন? নাকি সরাসরি বাপের বাড়ি গিয়ে ওঠা? তা উঠুক না। অনুব্রতদের আগে জানালে তারা কি বাধা দিত? আর ওই রঞ্জিত সেনগুপ্ত যতই সারপ্রাইজ-সারপ্রাইজ বলে চেঁচাক, নির্ঘাত জানত মেয়ের আসার কথা। নিজেই হয়তো মেয়েকে বলেছে, আগে থেকে কিছু জানাস না। যত্ত সব গাড়োয়ানি রসিকতা। উঠে গিয়ে শোওয়ার ঘর থেকে নিজের মোবাইলটা নিয়ে এল অনুব্রত। ছোটুই উপহার দিয়েছিল। অনুব্রত তেমন দরকার না হলে ব্যবহার করে না। ছোটুর দশ সংখ্যার নম্বরটা মাথায় থাকে না, মোবাইলে সামনে জিরো বসিয়ে তোলা আছে।

অনুব্রত লাগাল ফোনটা। বেশ খানিকক্ষণ ইংরেজি গান বাজার পর ছোটুর সাড়া মিলেছে, "হ্যাঁ বাবা, বলো?"

"তুই এখন কোথায়?"

"অফিসে। এবার বেরব। কেন?"

"এসব ফাজলামির কোনও মানে হয়?"

"কেন? কী হল?"

"হঠাৎ শ্রাবন্তী কলকাতায় এসে বাপের বাড়িতে ঢুকে গেল? অথচ সে যে আসছে, খবরটা পর্যন্ত দিলি না তুই?"

"ও, এই ব্যাপার!" ছোটুর স্বর নামল, "হঠাৎ বাই চাপল, গেল। এখন তো জেনেছ। আর কী?"

"তা বলে, এখানে না এসে..."

"আহা, একবার বাপের বাড়িতে উঠতে পারে না? ওখানে কী বড় একটা পুজো হয় বল তো! পুচকুন তো ওই লোভেই গেছে," একটু থেমে থেকে ছোটু বলল, "তা ছাড়া সল্টলেকের বাড়িতে এখন স্পেসও তো কম..."

"মানে? ওরা দু'জন এলে জায়গায় কুলোবে না?"

"তা নয়," একটু যেন অসহিষ্ণু শোনাল ছোটুর গলা, "এটা শ্রাবন্তীর ডিসিশন। আমি কী করব?"

"অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তটাকে তুই পরোক্ষে সাপোর্ট করছিস? তোর বাবা-মা'র খারাপ লাগতে পারে জেনেও?"

"কাম অন বাবা। আমার সাপোর্ট করা, না করায়, কার কী এসে যায়? আমার খারাপ লাগা না লাগারই বা কে তোয়াক্কা করে?"

"মানে?"

"ছাড়ো। বলতে ভাল্লাগছে না।"

"তবু শুনি?"

"দেখো বাবা, যার-যার ডিসিশন, তার-তার। শ্রাবন্তীর বাপের বাড়ি গিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়েছে, উঠেছে। আমার ভাল লাগুক না লাগুক, হু অ্যাম আই টু অবজেক্ট?" ছোটুর স্বর নিরুত্তাপ, "যেমন ধরো, তুমি আমাকে বা দাদাকে কিছু না জানিয়ে হুট করে একতলাটা লিজ দিয়ে দিলে। দাদা কী বলবে জানি না, কিন্তু আমার খারাপ লেগেছে। কিন্তু হু অ্যাম আই টু অবজেক্ট? কিংবা ধরো, বাড়িতে আমার ঘরে পেয়িং গেস্ট বসিয়ে তারপর আমাকে খবর দিলে। তোমরা আমার সম্মতির অপেক্ষা করেছ? করোনি। ঠিক কাজই করেছ। আমার ভাল লাগুক না লাগুক, আমি তো সত্যি বাধা দেওয়ার কেউ নই।"

"পেয়িং গেস্ট আমি বসাইনি ছোটু। ওটা তোর মায়ের শখ।"

"ছাড়ো, সব বুঝি। তোমার গজগজানি আমি শুনেছি। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলো তো, যদি আদৌ তোমার কনসেন্ট না থাকত, আমার ঘরে মা ঢোকাতে পারত দুটো উটকো মেয়েকে?"

"তা নয় রে। আসলে আমি তখন ভাবলাম, তোর মা যখন চাইছে...মা'র সঙ্গীমতো হবে..."

"কেন নিজেকে ডিফেন্ড করছ বাবা? আমি তো তোমাদের কাউকে অ্যাকিউজ করিনি। তবে এটাও তোমাকে মানতে হবে, আমাদের অনেক সিদ্ধান্ত তোমাদের পছন্দ হবে না। যেমন, তোমাদের অনেক সিদ্ধান্ত আমাদের পছন্দ হয় না। উই উইল লিড আওয়ার লাইফ অ্যাজ উই প্রেফার। তোমরাও তোমাদের মতো করে নিজেদের জীবন কাটাও।"

মাথায় যেন কেউ ডাঙস মারছিল অনুব্রতর! কেটে দিল ফোনটা। বসে আছে নিথর।

করবী ঢুকেছে ঘরে। চোখ কুঁচকে বলল, "কী ব্যাপার? গ্লাস সাজিয়ে চুপ

করে বসে আছ যে বড়?"

অনুব্রত জবাব দিল না।

করবী সন্দিগ্ধ মুখে তাকাল, "কী হল? শরীর খারাপ লাগছে?"

"না...ভাবছিলাম পুজোর সময়ে কোথাও একটা ঘুরে আসি।"

"কোথায় যাবে? দিঘা-পুরী, কোথাও জায়গা মিলবে না।"

"কল্যাণীতে যাই চলো। দিদির বাড়ি। সপ্তমীর দিন ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়ি।"

"হঠাৎ এমন ইচ্ছে?"

"শ্রাবন্তী পুচকুনকে নিয়ে এখন কলকাতায়। বাপের বাড়ি। সপ্তমীর দিন দর্শন দিতে আসবে।"

করবী ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে। কিছু যেন তার বোধগম্য হচ্ছে না।

অনুব্রত তেতো হাসল, "বুঝলে না তো? ছোট্ট আমায় আজ ভাল শিক্ষা দিয়েছে। ওদের জীবন, ওদের জীবন। আমাদের জীবন, আমাদের জীবন। বেড়ে চলেছে, তাই না?"

অনুব্রতর হতে হাত ছোঁয়াল করবী। ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপছিল অনুব্রত।

গোরাবাজার থেকে হেঁটেই ফিরছিল রূপসা। দুপুরে অরুন্ধতীর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল আজ। ব্যাপক খাইয়েছে। ইলিশ, ভেটকি, চিংড়ি — মাছের একেবারে ছড়াছড়ি। অরুন্ধতীর মায়ের উপরোধে পড়ে শেষ পাতে ছানাবড়া পর্যন্ত নিতে হল। কী কিটকিটে মিষ্টি! কেন যে লোকে ছানাবড়ার এত সুখ্যাত করে! ওতে আছেটা কী, গাদা খানেক ক্যালরি ছাড়া? লাভ হল একটাই, মুখটা এখনও মেরে আছে। ওদিকে পেটও আইঢাই, রাতে আর রূপসা কিছু খেতে পারবে বলে মনে হয় না।

তবে দুপুরটা আজ কাটল বেশ। বিয়ের পর সেই যে অরুন্ধতী বরের লেজ ধরে দুবাই পাড়ি দিয়েছিল, তারপর এই প্রথম ফিরল দেশে। বাচ্চা হবে অরুন্ধতীর, ডিসেম্বরে এক্সপেক্টেড ডেট। এখন বেশ কয়েক মাস বাপের বাড়ি আলো করে থাকবে। কলেজের বন্ধুদের অনেকেই পুজোর সময়ে আসে বহরমপুরে, তাদের সবাইকে নিয়ে একটা জমায়েতমতো করতে চেয়েছিল অরুন্ধতী। প্ল্যানটা সফল হয়নি, হাজির সাকুল্যে মোটে তিনজন। তাতেই নরক গুলজার। কেয়া আর শীলার হাসিতে যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছিল অরুন্ধতীদের ক্লাইভের আমলের বাড়িটা। বিয়ে হয়ে কারওরই মুখে রাখঢাক নেই, আদি রসের ফোয়ারা ছোটাচ্ছিল তিনজনে। রূপসার তো এক-একসময় কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল রীতিমতো। ভাবতে অবাক লাগে, ওই কেয়া, শীলা, অরুন্ধতীরা কী মুখচোরা ছিল কলেজে! বিয়ে ব্যাপারটা সত্যিই মেয়েদের অনেক বদলে দেয়।

অরুন্ধতীর বদলটা তো দেখার মতো। রূপসার এখনও চোখে ভাসে রোগাসাগা মেয়েটার মিষ্টি-মিষ্টি মুখখানা। সে এখন কী গোলগাপ্পা! সর্বাঙ্গে তার চেকনাই। মোমে মাজা ত্বক, প্লাক করা ভুরু, কায়দা করে কাটা চুল। গলায় সরু প্ল্যাটিনামের চেন। স্বচ্ছলতা যেন উপচে পড়ছে। এরকমই একটা আদুরে-আদুরে জীবনই তো চেয়েছিল অরুন্ধতী। রূপচর্চা ছাড়া আর কিছু করতে হবে না, দেশ-কাল-সময় নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা থাকবে না, শুধু একটা বিলাসবহুল সংসারের রানি হয়ে, পায়ের উপর পা তুলে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কী আশ্চর্য, তাই তো পেয়েছে। স্বপ্ন তা হলে সফল হয় কারও-কারও? কেয়া, শীলাও অবশ্য খারাপ নেই। দিব্যি বরসোহাগী বউটি হয়ে সংসারপাতি করছে। কেয়া তাও একটা স্কুলের প্যারাটিচার, শীলা নিছকই গৃহবধূ। এখনও বাচ্চাকাচ্চা না হলেও সংসারই যে তাদের জীবনের একমাত্র অভিমুখ, তা ওদের কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায়।

রূপসা আপনমনে হাসল একটু। অদূরে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের উঁচু পাঁচিল, সেদিকে তাকাল ক্ষণেক। আবছাভাবে মনে হল, ভিতরের কয়েদিগুলোর জীবনের সঙ্গে তার বান্ধবীদের গার্হস্থ্যর কতটুকুই বা প্রভেদ? অন্দরের কেউই তো বাইরের জগৎটাকে দেখতে পাচ্ছে না। একটা বাঁধা গণ্ডির মধ্যে পার করে দিচ্ছে সময়। বান্ধবীরা স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব মেনে নিয়েছে, কয়েদিরা নিরুপায়, এইটুকুই যা তফাত।

রূপসাকে যদি ওই বোদা-বোদা জীবন পালন করতে হয়? নাঃ, রূপসা ভাবতেই পারে না! মা-বাবা তো কবে থেকে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে, রূপসা একবার মুখের কথা খসালেই নেমে পড়বে ময়দানে। ঢুঁড়ে-ঢুঁড়ে ঠিক হাজির করবে কোনও তথাকথিত সুপাত্র। রূপসা ওই পাঠশালায় যাচ্ছে না। আসলে যেতেই পারছে না। মগজে একটা পোকা ঢুকে গেছে যে। কোনও ছকে বাঁধা সংসারের গণ্ডিতে আর তো স্থিত হতে পারবে না সে। এই বড়সড় পৃথিবীটায় রূপসার যে আরও কিছু ভূমিকা আছে, এটা সে ভোলে কেমন করে? ধারণাটার মধ্যে হয়তো খানিকটা ছেলেমানুষি আছে। হয়তো বা খানিক অপরিপক্কতা। কিন্তু রূপসার কাছে বুঝি এটাই প্রাজ্ঞতা। কিছুতেই সে ভিড়ের একজন হতে চায় না।

বিকেল প্রায় শেষ। কার্তিক মাস পড়ে গেছে, এখন ঝুপ করে সন্ধে নেমে যায়। বাতাসে একটা পলকা শিরশিরে ভাব। কাছারি ময়দানে কুয়াশার আভাস। বড় মাঠটার ধারে হঠাৎ কলেজের রবিউলের সঙ্গে দেখা। রবিউল খেয়াল করেনি, হনহনিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল, রূপসাই ডাকল তাকে, "কী রে, চললি কোথায়?"

"বাস ধরব রে। খাগড়ায় একটা কাজ আছে," রবিউল থেমেছে, "তুই কবে এলি?"

"সে তো প্রায় এক সপ্তাহ। পঞ্চমীর দিন।"

"তা হলে তো ফেরার সময় হয়ে এল? তোর কাজকর্মের কদ্দুর? এগোচ্ছে?"

"আহিস্তা, আহিস্তা...তুই আর নেটে বসছিস না?"

"লাভ নেই। পাব না। স্কুল সার্ভিসের জন্য প্রিপেয়ার করছি, ওটা যদি লেগে যায় তো..."

"স্কুলেই গেঁথে যাবি? এম এ-তে তোর অত ভাল রেজাল্ট ছিল..."

"ওটাও ছিল লাক। নেটে তিনবার বসে পেলাম না, সেটাও লাক। স্কুলের চাকরিটা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাই ওই পথেই এগোই।"

আরও দুটো একটা কথা বলে নিজের পথে এগোল রূপসা। রবিউলের জন্য খারাপ লাগছিল। এত ব্রাইট ছেলে...কল্যাণীতে এম এ পড়ার সময়ে বলত, মুর্শিদাবাদ নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করার খুব ইচ্ছে। এখন কেমন হতাশায় ভুগছে! অথচ রবিউলের তুলনায় আহামরি রেজাল্ট না করেও রূপসা তো বেশ সুযোগ পেয়ে গেছে রিসার্চে। এসব কারণেই কি ভাগ্য মানতে শুরু করে মানুষ? ভাবতে-ভাবতেই রূপসা পৌঁছে গেছে কাদাই মোড়ে। কাছেই রূপসাদের বাড়ি। আগে একতলা ছিল, বছরকয়েক আগে দোতলা উঠেছে। তুলেছে রূপার বাবা-মা, জয়েন্ট ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে।

একতলার গ্রিল দরজা খোলাই ছিল। ঠেলে ঢুকতেই রূপসার চোখ গেছে ডানদিকের ঘরে। বাবা বেতের চেয়ারে বসে। সামনে কে একজন, মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

মেয়েকে দেখে পরিমল ডাকল, "রুপু, এদিকে আয়। দেখ তো একে চিনতে পারিস কিনা?"

দু'-এক সেকেন্ড সময় নিল রূপসা। হাসি হাসি মুখে বলল, "হ্যাঁ, প্রতীকদা।"

পরিমল বলল, "কারেক্ট। প্রতীক এখন রানিনগর হাই স্কুলে পড়াচ্ছে। আমাদের সমিতির ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার হয়েছে এবছর।"

পরিমলের একদা ছাত্র প্রতীকের মুখে সৌজন্যের হাসি। রূপসাও ঠোঁট ফাঁক করল সামান্য। তারপর কী ভেবে যেন বসেই পড়ল ঘরে। নির্ঘাত সমিতি, সংগঠন নিয়ে কথা চলছে দুজনের। শুনতে রূপসার ভারী মজা লাগে। প্রহসন দেখার আনন্দ মেলে।

হ্যাঁ, ওই লাইনেই এগোচ্ছে বাক্যালাপ। প্রতীক বলছে, "মোটামুটি আমি একটা হিসেব করেছি স্যার। মুর্শিদাবাদ, জঙ্গিপুর আর সাগরদিঘির সিক্সটি পারসেন্ট গার্জেন কন্সটিটুয়েন্স আমাদের বাঁধা।"

পরিমল জিজ্ঞেস করল, "আর জিয়াগঞ্জ? ডোমকল?"

"ওদিকের ছবিটা এখনও পরিষ্কার নয়। ফিফটি-ফিফটি হতে পারে।"

"আমি জানি। সেই জন্যই তো বার-বার বলছি আমাদের সংগঠনকে আরও কোমর বেঁধে লাগতে হবে।"

"সে তো বটেই। কিন্তু সমস্যা হয়েছে, একটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া তো চলছে..."

"থামাতে হবে হাওয়া। স্তালিন যদি হিটলারের ব্লিৎস্ক্রিগকে রুখে দিতে পারেন, আমরা এটুকু পারব না?"

"পারতেই হবে। পারতেই হবে!" প্রতীক জোরে-জোরে মাথা দোলাচ্ছে। উজ্জীবিত স্বরে বলল, "তা হলে তো লক্ষ্মীপুজোর পরই আমাদের একদিন বসতে হয় স্যার। ফর্ম্যালি। আপনি সুধন্যদাকে একটা ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মিটিং ডাকতে বলুন।"

"সে হবে'খন। তুমি তোমার ডিউটিগুলো করো।"

"নিশ্চয়ই। আজ তা হলে চলি স্যার?" প্রতীক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার তো স্যার সামনের ফেব্রুয়ারিতে রিটায়ারমেন্ট, না?"

"হুঁ। তো?"

"আপনাকে একটা দারুণ ফেয়ারওয়েল দেব ভাবছি। যেভাবে আপনি তিলে-তিলে গোটা জেলায় সংগঠন গড়ে তুলেছেন, তা তো ভোলার নয়। বিনিময়ে সমিতিরও তো একটা কৃতজ্ঞতা দেখানো উচিত।"

পরিমল আড়চোখে রূপসাকে দেখল একবার। তারপর অপ্রস্তুতভাবে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন। ফেব্রুয়ারির এখন ঢের দেরি।"

প্রতীক বেরিয়ে যাওয়ার পর টেবিলে পড়ে থাকা ঢাউস মিষ্টির বাক্সটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল রূপসা, "এটা বুঝি তোমার ছাত্র এনেছিল?"

"আর বলিস কেন!" পরিমল লজ্জা-লজ্জা হাসল। চশমার কাচ গেঞ্জিতে মুছে আবার লাগাল চোখে, "যে ছাত্র আসে, তারই হাতে প্যাকেট। এত মিষ্টি কে খায় বল দিকিনি?"

"তুমি তো একদমই ছোঁবে না। সুগার লেভেলটা তোমার মাঝে-মাঝেই চড়ে যাচ্ছে। ওষুধপত্র খেয়েও। মনে রেখো," রূপসার মুখে হাসি ফুটেছিল, সহসা সে গম্ভীর, "তোমার এই ছাত্রটি কবে মাস্টারি পেল?"

"অনেক দিন," বলেই পরিমল শোধরাল, "তা প্রায় দেড় বছর।"

"তুমি তো ওকে প্রাইভেট পড়াতে, তাই না? যদ্দূর আমার মনে পড়ছে, ছাত্র হিসেবে ও মোটেই ভাল ছিল না। তুমিই বলতে, ওর গ্রামারের কোনও জ্ঞান নেই, তিনটে নির্ভুল ইংরিজি সেনটেন্স লিখতে পারে না..."

"তো কী আছে? পরে উন্নতি করেছে। এসএসসি তো পাশ করেছিল।"

"এমনই রেজাল্ট করল, যে বাড়ির দরজায় চাকরি মিলে গেল?" রূপসার স্বরে ব্যঙ্গ এসে গেল, "তোমার প্রতীক তো রানিনগরেরই ছেলে, তাই না?"

"ওফ, তুই এমন বলিস না...সংগঠনটাকেও তো ধরে রাখতে হবে, নয় কী? প্রতীকের মতো ডেডিকেটেড কর্মী ক'টা মেলে?"

"নিশ্চয়ই। কারণ, এই ধরনের ছেলেরাই তো নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হয়। তার প্রথম কারণ, এরা চাকরিতে অযোগ্য। দ্বিতীয় কারণ, এরা নির্বোধ। তৃতীয় কারণ, এরা প্রশ্নহীন আনুগত্য দেয়। ফলে এদের দিয়ে যা খুশি কাজ করানো যেতে পারে। জেলার স্কুলগুলোর পরিচালন সমিতিতে পার্টির দখলদারি রাখার কাজ...তোমাদের সংগঠন তো পার্টিরই লেজ। নয় কি?"

"তুই বড্ড বাজে কথা বলিস রুপু।"

"বাজে, কি খাঁটি, টের পাবে। তোমাদের এই সংগঠনপ্রীতি মানুষ যে কী চোখে দেখছে, তা কি জানো? একটা অযোগ্য লোককে চাকরিতে ঢোকানো মানে একটা যোগ্য লোককে বঞ্চিত করা। এটা বোঝো? হঠাৎ একদিন দেখবে পায়ের নীচে মাটি নেই! তখন টের পাবে, তোমাদের সংগঠন-ফংগঠন সব চোরাবালি। তোমাদের নৌকো থেকে তখন ইঁদুরের মতো পালাবে ওই প্রতীকরা!"

"তোর লেকচার মারাটা থামা তো এবার," পরিমল লঘু ধমক দিল, "যা, ভিতরে যা।"

"খুব গায়ে লাগছে বুঝি কথাগুলো?"

"ফের ডেঁপোমি?" পরিমল এবার একটু রেগেই গেছে, "তোমাদের স্টাডি সার্কল, না গুষ্টির পিণ্ডি, সেখানে এসব আলোচনা হয় বুঝি?"

"সরি বাবা, তোমাদের ওই পেটি পলিটিক্সে আমাদের বিন্দুমাত্র রুচি নেই।"

"বুকনি ঝাড়িস না। একবার তো মার খেতে-খেতে বেঁচে গেছিস। ফের যদি কিছু হয়, আমি কিন্তু যাব না।"

"আগেরবারও কি গিয়েছিলে? ডেকেছি তোমাকে? তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, ভবিষ্যতে যদি কোনও ঝঞ্ঝাটেও পড়ি, নিজেই তা সামলাব।"

"কথাটা খেয়াল রেখো। শিক্ষক আন্দোলনের নেতা পরিমল সেনের একটা মানমর্যাদা আছে, দয়া করে তার নামটি ডুবিও না। যে-দীর্ঘ সংগ্রাম আমরা করেছি..."

"ওফ, আবার ভাষণ না শুরু হল। বস্তাপচা বুলিগুলো বড় ফাঁপা লাগে আজকাল। কবে ঘি খেয়েছে, কত কাল তার গন্ধ শুঁকে কাটাবে?"

মিষ্টির প্যাকেটটা তুলে নিয়ে টুকুস করে সরে পড়ল রূপসা। ভিতর দরজার পরেই অন্দরের সরু প্যাসেজ। ডাইনে রান্নাঘর বাথরুম, বাঁয়ে আরও দু' খানা ছোট-ছোট ঘর। প্যাসেজ শেষে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি।

রান্নাঘরে ফ্রিজের মাথায় বাক্সখানা রেখে রূপসা দোতলায় যাচ্ছিল, অমনই বাঁদিক থেকে কৃষ্ণার গলা, "কী রে, এতক্ষণে ফেরা হল?"

দেখে ফেলেছে মা! রূপসা উঁকি দিল দরজায়। মুচকি হেসে বলল, "আগেই এসেছি। বাবার সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করছিলাম।"

"ফের তর্ক জুড়েছিলি? কেন রে?"

"তুমি তো ক্লাসে লজিক পড়াও মা। নিশ্চয়ই জান, তর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়।"

"তোকে নিয়ে আর পারি না। মানুষটাকে চটিয়ে কী সুখ যে পাস? তোর বাবা একটা বিশ্বাস নিয়ে থাকে..."

"প্রথমত, বিশ্বাস একটি বায়বীয় বস্তু। দ্বিতীয়ত, বিশ্বাস থেকেই অন্ধত্ব..."

"ক্ষ্যামা দে মা। আমি বাপ-মেয়ের ঘুষোঘুষিতে নেই!" কৃষ্ণা হাত ওঠাল, "তা সারাটা দিন কি বন্ধুর বাড়িতেই কাটল?"

"আর কোথায় যাব?"

"তোর রাঙা ঠাকুরমার বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসতে পারতিস। মণিপিসিদের ওখানেও তো বিজয়া করতে যাওয়া উচিত। তারপর ধর..."

রূপসা প্রমাদ গুনল। লম্বা লিস্টখানা এবার আওড়াবে মা। সমুজ্যাঠা, খাদুমামা, লেবুমাসি। শহর জুড়ে এত আত্মীয়স্বজন, সকলকে কি মুখ দেখানো সম্ভব? মাত্র এই ক'দিনে? আর গেলেই এমন আদরযত্নর ধুম পড়ে যায়, প্রাণ ওষ্ঠাগত করে ছাড়ে একেবারে। তবু রূপসা মাথা নেড়ে দিল, যাব।

"আর গেছিস! রোববারই তো পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবি!" কৃষ্ণা গজগজ করছে, "শুধু তর্কই শিখেছ, কর্তব্যজ্ঞানটা আর হল না। আশা করি, কলকাতায় যাদের বাড়িতে থাক, তাদের অন্তত ফোনে একটা বিজয়ার প্রণাম জানিয়েছ।"

রূপসা জিভ কাটল, "এঃ, মনেই ছিল না।"

"তা থাকবে কেন? এত পাকা-পাকা কথা সারাক্ষণ মাথায় ঘোরে।" হালকা ভর্ৎসনার সুরে কৃষ্ণা বলল, "নিজেই না গপ্পো কর, মাসিমার মতো মানুষ হয় না, আমাদের জন্য এই করে, ওই খাওয়ায়!"

"সরি, সরি। ফিরে গিয়েই করব।"

বলেই ঘুরতে যাচ্ছিল রূপসা, ফের কৃষ্ণার বাধা, "অত ছটফট করছিস কেন? একটু স্থির হয়ে দাঁড়া না।"

"উফ জ্বালালে," রূপসা ঢুকল ঘরে, "বলো।"

এক সময়ে এটা ছিল বাবা-মায়ের শয়নকক্ষ। এখন পাঁচমেশালি ঘর। কী আছে, কী নেই! আলমারি, আয়না, টিভি, চেয়ার, টেবিল, এমনকী, একটা তক্তপোশও। দোতলায় রূপসার ঘরের পাশে এখন বাবা-মা'র বেডরুম, তবে দিনের বেশিরভাগ সময়টা দু'জনে নীচেই কাটায়। পরিমলের কাছে তো লোক আসার বিরাম নেই, কৃষ্ণাও এঘরে বসে টিভি-ফিভি দেখে।

এখন চলছিল টিভি। বাংলা নাচগানের রিয়্যালিটি শো। রিমোট টিপে দৃশ্যটা মুছে দিল কৃষ্ণা। মেয়েকে নরম করে ডাকল, "আয় এখানে।"

মা'র পাশে বসল রূপসা। ভুরু কুঁচকে বলল, "আবার বিয়ে-টিয়ের কথা পাড়বে নাকি?"

"আগে শোনই না। চা খাবি?"

"না... পরেন্টে এসো।"

"আমার একটা কথার পষ্টাপষ্টি জবাব দিবি? বল, লুকোছাপা করবি না?"

"আমি তো কিছুই গোপন করি না। তোমরা টেনশন করবে বলে গোলমালের খবরটা তো চেপে যেতে পারতাম। গেছি? বাবা বিরক্ত হবে জেনেও সব খুলে বলিনি?"

"ওটা অন্য ব্যাপার!" মেয়ের হাতে-হাত রাখল কৃষ্ণা। ঈষৎ ব্যগ্র স্বরে বলল, "তুই কি কাউকে পছন্দ করেছিস? বল না আমায়? সে যেমনই হোক, তোর বাবার সঙ্গে মতে মিলুক, ছাই না মিলুক, আমরা ঠিক মেনে নেব।"

পলকের জন্য বিতানের মুখটা মনে পড়ল রূপসার? কেন যে পড়ল? ওই অসভ্য ছেলেটাকে...রূপসা তেতো গলায় বলল, "তোমায় তো অজস্র বার বলেছি মা। তেমন কোনও রিলেশন আমার কারওর সঙ্গে গড়ে ওঠেনি।"

"তা হলে তো বলাই যায়," কৃষ্ণা গলা ঝাড়ল, "ব্যাপারটা কী হয়েছে জানিস? সেই যে তোর মণিপিসির মেয়ে বুলির বিয়েতে তুই এসেছিলি, তখনই মহিলা তোকে দেখেছেন।"

"কে মহিলা?"

"মণির দূরসম্পর্কের ননদ। কলকাতাতেই থাকেন।"

"তো?"

"তোকে মহিলার ভীষণ পছন্দ। মণি খুব ঝুলোঝুলি করছিল বলে তোর একখানা ছবি দিয়েছিলাম। ছেলেকে পাঠানো হয়েছিল ফোটোটা। সে এককথায় রাজি!" কৃষ্ণা ঝপ করে থেমে গেল। লক্ষ করছে মেয়ের প্রতিক্রিয়া। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, "ছেলে কিন্তু অত্যন্ত ভাল। লেখাপড়ায় দারুণ ব্রিলিয়ান্ট। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স, নাসার সায়েন্টিস্ট। তোর সঙ্গে খুব ম্যাচ করবে। আমি অবশ্য বলেছি, বিয়ে হলেও রূপসা পিএইচডি শেষ না করে এখান থেকে যাবে না। তবে চাইলেই তো তুই ওখানে গিয়েও ইচ্ছেমতো পড়াশোনা চালাতে পারিস।"

"বাঃ, দারুণ প্রপোজাল তো! শুনেই লোভ হচ্ছে!"

"ছেলের ফোটো দেখবি? মণি দিয়ে গেছে।"

"কী হবে? ও তুমিই রেখে দাও।"

কৃষ্ণার ভুরু জড়ো হল, "মানে?"

"প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। আমি বিয়ে-টিয়েতে নেই।"

"কেন? তোর আপত্তি কীসের?"

"তোমাকে তো অনেক বার বলেছি। আমার অন্য কাজ আছে।"

"কী এমন কাজ, যার জন্য বিয়ে-থা করা যায় না?"

"আছে। তুমি তো জান মা, আমি একটা মিশন নিয়ে..."

"থাক। তোমার ওই বড়-বড় কথা শুনে আমার কাজ নেই। দুনিয়ার তাবড় তাবড় লোক বিয়ে, সংসার করেও অনেক মহান-মহান কাজ করেছে!"

"তারা পেরেছে। আমার সেই ক্ষমতা নেই। ব্যস, চুকে গেল।"

"উঁহু, ওভাবে এড়াস না। একটু প্র্যাক্টিক্যাল হ," কৃষ্ণা মেয়ের পিঠে হাত রাখল, কেন বুঝছিস না, "ছেলেদের ব্যাচেলর থাকা আর মেয়েদের বিয়ে না করা, দুটো ঠিক এক জিনিস নয়। মেয়েদের শরীরের অনেক জটিল ব্যাপার-স্যাপার থাকে, তাদের প্রকৃতির নিয়ম কিছু মানতে হয়...সবই তো বুঝিস।"

রূপসা এবার বেশ বিরক্তই হল। এখনও কী যে সব আদ্যিকালের ধারণা নিয়ে পড়ে আছে মা! যথেষ্ট শিক্ষিত হওয়ার সত্ত্বেও! দেখতে পায় না, কত মেয়ে আজকাল বিয়ে না করে থাকছে? শরীরের জুজু দেখানোটা তা এখন নেহাতই অর্থহীন।

রূপসা গোমড়া গলায় বলল, "জানই যখন আমি সব বুঝি, তখন বিয়ে সংক্রান্ত ভাবনাটাও আমার উপর ছেড়ে দাও।"

কৃষ্ণা বেশ আহত হয়েছে। আর কিছু বলছে না। একটুক্ষণ চুপ বসে থাকে রূপসাও উঠে পড়ল। মার কাঁধে আলতো হাত ছুঁইয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মা-বাবারা এত অবুঝ, যেচে-যেচে কষ্ট পায়। সল্টলেকের বাড়িতেও তো দেখছে, কোনও কথায় ছেলেদের প্রসঙ্গ উঠলেই মাসিমার স্বর কেমন ভারী হয়ে যায়। মিনিংলেস, একেবারেই মিনিংলেস।

উপরে নিজের ঘরে এল রূপসা। আধুনিক আসবাবে সুন্দর সাজানো কামরা। লো ইংলিশ খাট, ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিংটেবিল, জানলায় পেলমেটে ঝোলানো পর্দা...এককালে নীচে গাদাগাদি করে থাকতে হত, তাই যেন মা-বাবা বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য পুরে দিয়েছে ঘরে।

খাটে বসে রূপসা ভাবল ক্ষণকাল। সল্টলেকে একটা ফোন করবে নাকি? মাসিমা খুব খুশি হবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু রবিবারই তো দেখা হবে, বাড়তি মেলোড্রামা না করলেও তো চলে। বরং কাজের ফোনটা সারা দরকার।

মোবাইল হাতে নিয়ে রূপসা চেনা নম্বরটা টিপল। ও প্রান্তে অনিমেষ। রূপসাদের নবদিশার প্রতিষ্ঠাতা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক।

রূপসা বলল, "শুভ বিজয়া অনিমেষদা।"

"হুঁ," শুভ বিজয়া। অনিমেষের মার্জিত কণ্ঠ ভেসে এল, "তুমি তো বহরমপুরে গিয়েছিল, ফিরেছ নাকি? সোমবার কিন্তু আমাদের বসা আছে।"

"ওটা জানার জন্যই তো ফোন করা। যে-বিষয়ে আলোচনার কথা বলেছিলাম, সেটা থাকছে তো অ্যাজেন্ডায়?"

"কোনটা বল তো? ওই পল্লবের ব্যাপারে..."

"শুধু পল্লব কেন। সন্দীপ, তনুকা, ইন্দ্রনীল...ওদের কারওই দৃষ্টিভঙ্গি তো নবদিশার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলছে না।"

"হুম, থাকছে প্রসঙ্গটা। দেখি, সবাই কী বলে।"

"যে যাই বলুক অনিমেষদা, আমাদের কিন্তু সতর্ক হওয়া দরকার। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমি কিন্তু বুলেটের মাধ্যমে হিংসা প্রতিরোধের প্রবল বিরোধী।"

"ঠিক আছে, সোমবার এসো তো। খোলাখুলি কথা হবে।"

ফোন ছেড়ে রূপসা একটু স্বস্তি পেল কি? নবদিশায় পল্লব, তনুকারা যেভাবে সংখ্যায় বাড়ছে, তারাই না এবার কর্ণধার হয়ে বসে। তা হলে অবশ্য রূপসাকে ছাড়তে হবে স্টাডি সার্কল। নীতি-আদর্শের প্রশ্নে আপোষ তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু এখন রূপসা কী করে? ফেসবুক? এণাক্ষী ফোন করেছিল পরশু। কী সব ছবি আপলোড করেছে বলছিল। দেখবে নাকি? ধুত, ভাল লাগছে না। ফেসবুকে বসলে এত চেনাজানা লোকের সঙ্গে মোলাকাত হবে, আর বেরোনো যাবে না। বরং নিজের কাজটা নিয়ে বসলে হয়। সম্প্রতি প্রচুর মেটিরিয়াল ও ডাউনলোড করেছে, পড়ে-পড়ে ওগুলো একটু কাটছাঁট করা দরকার।

লাগোয়া বাথরুম থেকে পোশাক বদলে এল রূপসা। আয়নায় তাকাল। মুখে একটা শুকনো-শুকনো ভাব। বাতাসে আর্দ্রতা কমে গেছে বলে চামড়া টানছে বোধ হয়। আর একটু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। নাক, চোখ কপাল, সবই মোটামুটি পদের। কিন্তু তাকে কি আদৌ রূপসী বলা যায়? নাসার সায়েন্টিস্টটার কী দেখে যে তাকে মনে ধরল? ফুঃ!

মুখে সামান্য ক্রিম ঘষে রূপসা ল্যাপটপ নিয়ে পড়ল। কিন্তু খুলতে না খুলতেই বাধা। মোবাইল।

স্ক্রিনে দৃষ্টি রাখতেই রূপসার ভুরুতে মোটা-মোটা ভাঁজ! বহরমপুর আসা ইস্তক কত বার যে কেটে দিয়েছে ফোনটা, তবু নির্লজ্জ ছেলে আবার জ্বালাচ্ছে! টুং টাং মেসেজেরও তো কামাই নেই, ডিলিট করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে গেল রূপসার।

আবার কেটে দেবে? উঁহু, একটু ঝাড় দেওয়া দরকার।

ফোনটা ধরেই রূপসা দাবড়াল, "ব্যাপারটা কী? কেন ডিস্টার্ব করছিস?"

"এখনও রাগ পড়েনি?" বিতানের সদা উচ্ছল স্বর যেন ঈষৎ নিষ্প্রভ, "আমাকে লোচ্চা-লফাঙ্গা ধরে নিলি নাকি?"

"বুঝতে এত সময় লাগল?" রূপসা প্রায় খেঁচিয়ে উঠল, "তুই কি অন্য কিছু?"

"যাঃ বাবা! কী এমন গর্হিত কাজ করলাম? স্রেফ একটা চুমু বই তো নয়! তাতে তুই নিশ্চয়ই ক্ষয়ে যাসনি?"

রূপসা চিড়বিড়িয়ে উঠল। কী স্পর্ধা! পাগলা-পাগলা ভাবটা ভাল লাগে বলে যেই না একটু লাই দিয়েছে, অমনই মাথায় চড়ে বসার চেষ্টা! ছুটি পড়ার আগের দিন ইউনিভার্সিটির পুকুরপাড়ে বসে এমনিই আড্ডা মারছিল দুজনে, কথা নেই, বার্তা নেই, অমনই দুম করে চুমু! রূপসার সম্মতির পরোয়া না করেই! রূপসাকে কী ভাবে বিতান? ওর মতো একটা নেশাখোর ব্যান্ড গাইয়ের ফিয়াসে?

কঠোর গলায় রূপসা বলল, "তুই কিন্তু ক্ষয়ে গেছিস। আমার চোখে!"

"আমার একটা শক্তপোক্ত ভাবমূর্তি ছিল তা হলে?"

"অন্তত এতটা বে-সহবত বলে ভাবিনি।"

"সহবতের কোনও শাস্ত্রে চুমু সম্পর্কে কিছু বলা আছে রে? আমি তো জানতাম, চুমু একটা স্টেটমেন্ট। ভালবাসার।"

"তোর ওই চালাক-চালাকমার্কা বোকা-বোকা কথাগুলো বন্ধ করবি?" ভাল মতোই জানিস, ন্যাকা-ন্যাকা প্রেম ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি না। অ্যান্ড আই মিন ইট।"

"ওঃ নো! তুই কি চুমুর চেয়েও অ্যাগ্রেসিভ কিছু আশা করেছিলি? সরি, বুঝতে পারিনি রে।"

"এখনও ইয়ার্কি? তোর কি ঘটে ঢোকেনি, তুই যেটা করেছিস, সেটাকে আমি ডিসলাইক করি? একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে?"

"তাই বুঝি? কিন্তু তেমনটা তো মনে হয়নি তখন? দিব্যি তোর ঠোঁট জোড়া ফাঁক হল, চমৎকার কো-অপারেট করলি, জড়িয়েও ধরেছিলি আমাকে!"

ওই কারণেই তো রূপসার এত ক্ষোভ। শুধু বিতানের উপর নয়, নিজেকেও দুষছে। ঠিক সেই মুহূর্তে কোত্থেকে যে একটা ভাললাগা এসে রূপসাকে ভর করেছিল? ছি, ছি, রূপসাকে মোটেই ওই ভূমিকায় মানায় না। সাধে কি রূপসা দিনরাত প্রাণপণে ভুলে থাকতে চাইছে ওই বিশেষ ক্ষণটিকে! মায়াবী সন্ধেটা নিছকই এক বিভ্রম!

রূপসা ভার গলায় বলল, "আমার ভুল হয়ে গেছে। তখনই তোকে একটা থাপ্পড় মারা উচিত ছিল!"

"শুধরে নে ভুল। ফিরে আয়। এসে মার। আমি তো ওয়েট করছি।"

"উফ," এই উন্মাদকে নিয়ে যে রূপসা কী করে? ফোনটা ধরাই কাল হয়েছে। এখন আর মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই, আরও পেয়ে বসবে। ঠান্ডা গলায় রূপসা বলল, "একটু সেন্সিবল হ বিতান। কেন বুঝিস না, তুই যেমনটা চাস, সেরকম রিলেশন আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা অসম্ভব।"

"তুই কি এগজ্যাক্টলি জানিস, আমি তোর কাছ থেকে কী চাই?"

"আমার জানার আগ্রহ নেই।"

"তোর ডাক্তার দেখানো দরকার। মানুষের স্বাভাবিক ইন্সটিংক্টগুলো তোর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নবদিশা এবার ছাড়।"

"উপদেশ ঝাড়িস না। আমার কী করা উচিত, আমি ঠিক করব।"

"শুধু কাঠখোট্টা বনে যাস না, প্লিজ। মানুষের কথা ভাবতে গেলে দেবী-ফেবী হওয়ার দরকার নেই রে। মানুষ থাকলেও চলে।"

"জ্ঞানটা মনে থাকবে। আর কিছু?"

"নাঃ। কলকাতায় এবার বড্ড তাড়াতাড়ি ঠান্ডা পড়ে গেল, সেটাই ভাবছি।"

"সে কী? পুজোর আগেও তো বেশ গরম..."

"তখন অনেক তাপ ছিল শহরে। তুই ছিলি যে, রাখছি।"

আলটপকা ফোনটা কেটে দিল বিতান। রূপসা হতভম্ব। পাগলটাকে একটু বিষণ্ণ শোনাল যেন? সত্যিই মনখারাপ? নাকি ঢং? কখন যে অ্যাক্টিং করে, কখনই বা সিরিয়াস...ধুত, রূপসা কেন ভাববে বিতানের কথা?

কী আপদ, রূপসা কেন যে বিতানের কথাই শুধু ভাবছে!

ডাইনিং টেবিলে বসে চা খাচ্ছিল করবী। ব্রেকফাস্ট সেরে নিজেদের ঘরে গেছে রূপসা, সম্পূর্ণা। অনুব্রত তৈরি হচ্ছে বাজার যাওয়ার জন্য। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করে করে ফর্দ বানাচ্ছে। মাছ-মাংসটা নিজেই আন্দাজ করে কেনে অনুব্রত, শুধু সবজি-মশলাপাতি আলাদা করে বলে দিতে হয়।

শুনতে-শুনতে করবী বলল, "আমারও একটা জিনিস আনতে হবে।"

ডিসেম্বরের গোড়াতেই এবার বেশ ঠান্ডা পড়েছে। মরসুমি সবজিতে আলো হয়ে থাকে বাজার। মনটা তাই এসময় ভারী প্রফুল্ল থাকে অনুব্রতর। চোখ নাচিয়ে বলল, "কী?"

"সকালে ফুলওয়ালিটা আজ বসেনি। একটা মোটা দেখে রজনীগন্ধার মালা চাই।"

অনুব্রতর কপালে একটা পাতলা ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের গীতাদির আজই কাজ বুঝি?"

"হুঁ।"

"যাচ্ছ তা হলে?"

"একবার গিয়ে দাঁড়াই। গীতাদি বারবার বলতেন, আমরাই তাঁর শেষ বয়সের সঙ্গী, তাঁর শেষ কাজে অবশ্যই যেন যাই। তার উপর ওঁর ছোট ছেলেটা পরশু সকালে নিজে এসে পার্কে কার্ড দিয়ে গেল..."

করবী আলগোছে বলল বটে, কিন্তু মনটা তার বেশ ভার-ভার হয়ে আছে আজ। সেই যখন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিল, তখন থেকেই। এত বেশি মনে পড়ছিল মানুষটাকে। আশি পেরিয়ে গিয়েছিলেন গীতাদি। ফরসা বলিরেখা আঁকা মুখখানায় স্নেহ যেন ঝরে পড়ত। কাজের মেয়ে কাম রাতদিনের একমাত্র সেবিকা কাম সখী বছরপঞ্চাশের সরোজাকে নিয়ে লাঠি ঠক-ঠক করে আসতেন পার্কে। নিজের কথা বলতেন না বড় একটা। রোগব্যাধির কথা তো নয়ই। আলাপের অনেকদিন পর করবীরা জানতে পেরেছিল, বাগবাজারের একটা নামী মেয়েদের স্কুলে হেডমিস্ট্রেস ছিলেন গীতাদি। টানা আঠেরো বছর। বেঞ্চিতে বসে ঘরোয়া নিন্দে-মন্দর আলোচনায় ছিল তাঁর ঘোর আপত্তি। বলতেন, লোকের শুধু খারাপটাই দেখলে মনটা নাকি পচে যায়। স্বামী মারা গেছেন গীতাদির চাকরি ফুরনোর আগেই। দুই ছেলে দূরে-দূরে থাকে। বহুকাল ধরেই তিনি প্রায় একা। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে কোনও নালিশ নেই। বড় ছেলে লন্ডনবাসী ডাক্তার। ছোট পাইলট, মুম্বইতে ফ্ল্যাট কিনেছে। কারও কাছেই যেতেন না গীতাদি। অভিমান নয়, নিজের বৃত্তে বাস করাটাই প্রিয় ছিল তাঁর। করবী যে বাড়িতে পেয়িং গেস্ট রাখল, সে তো গীতাদির পরামর্শেই। এতে নাকি করবীর ছেলে-ছেলে শোকটা লাঘব হবে। গীতাদি যে খুব ভুল বলেননি, করবী তো তা টের পাচ্ছে।

অনুব্রত ব্যাগ নিয়ে তৈরি। চটি গলাতে-গলাতে বলল, "তুমি কখন বেরবে?"

"গিয়ে তো শুধু দাঁড়ানো। এই ধরো, সাড়ে এগারোটা-বারোটা।"

"আমি কি যাব সঙ্গে? গাড়ি নিয়ে?"

"দরকার নেই। একটু তো পথ।"

অনুব্রত সিঁড়িতে গিয়েও থমকাল। ঘুরে বলল, "ডিউটিটা সেরেছ?"

"কী বলো তো?"

"আজ তারিখ কত খেয়াল আছে? সাতই ডিসেম্বর।"

"ও হ্যাঁ, তাই তো! আজ তো ছোটুদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি।"

"ভুলে গিয়েছিলে? তোমারও তা হলে বয়স হচ্ছে, অ্যাঁ?"

পলকাভাবে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে নেমে যাচ্ছে অনুব্রত। শুকনো হাসি ফুটল করবীর মুখে। সত্যি কি সে বুড়িয়ে যাচ্ছে? অনন্তকাল নয়, মাত্র আট বছর আগে বিয়ে হয়েছে ছোটুর। এখনও সেদিনের অনুষ্ঠান হইচই কানে বাজে। তবু দিনটা সে ভুলে গেল? রাজা একাই এসেছিল বিয়েতে, তিন-চার দিনের বেশি থাকেনি। আইরিনের তখন বাচ্চা হবে বলে ফিরে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি। তবু দুই ছেলেকে একসঙ্গে কাছে পেয়েছিল করবী। সেদিক দিয়ে ছোটুর বিয়ের তো একটা বিশেষ মূল্যও আছে। তাও কেন এই বিস্মরণ? অনুব্রত এখনও ছোট ছেলের ওপর যথেষ্ট চটে। পুজোতে রেগেমেগে কল্যাণী পালায়নি বটে, কিন্তু শ্রাবন্তীর সঙ্গে বেশ কাঠ-কাঠ ব্যবহার করেছিল সপ্তমীর দিন। এমনকী, পুচকুন যে অনুব্রতর অত আদরের, তার সঙ্গেও ভাল করে কথা বলেনি। সেই অনুব্রতরও মনে থাকল দিনটার কথা, অথচ করবী কিনা...ভালবাসা তো বটেই, রাগ বিরাগও কি স্মৃতিকে ঠুনকো করে রাখে? নাঃ, এ নিছকই একটা ভুল। সকাল থেকে গীতাদির ভাবনায় ডুবেছিল বলেই হয়তো তারিখটা সেভাবে টোকা দেয়নি মাথায়।

উঠে ফোনের কাছে গেল করবী। সাড়ে ন'টা বাজে, এখন আর ছোটুকে রিং করে লাভ নেই, সে এখন বেরিয়ে পড়েছে অফিসে। নিজেই গাড়ি চালায়, কোনও কল নেয় না এসময়। অতএব শ্রাবন্তীর মোবাইলেই...

"থ্যাঙ্ক ইউ মা। থ্যাঙ্ক ইউ," শ্রাবন্তীর উচ্ছল স্বর উথলে পড়ল, "আমিই আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।"

ক্ষণপূর্বের মনখারাপ ভাবটা ঢেকে করবী খুশি ফোটাল গলায়, "তাই নাকি? কেন গো?"

"আজ সন্ধেবেলায় আমাদের দু'-চারজন বন্ধু আসছে। ভাবছি, সপ্তমীর দিন আপনি যে পোলাওটা খাইয়েছিলেন, সেটাই রাঁধব।"

"তুমি রান্না করছ? আজ স্কুলে যাওনি?"

"ডুব মারলাম!" শ্রাবন্তীর হাবভাবে একটু যেন তাড়া, "বলুন না মা, কীভাবে বানিয়েছিলেন? দারুণ একটা গন্ধ আসছিল।"

"ওটা তো খুব সোজা গো। কড়াইতে তেল-ঘি মিশিয়ে গরম করে একটু বেশি পরিমাণ ছোট এলাচ থেঁতো করে দিয়ে দাও। তারপর চাল দিয়ে নেড়ে ভাজো। নুন-মিষ্টি দাও আন্দাজ করে। কিশমিশ, কাজু মেশাও। তারপর জল ঢেলে দাও। এক কৌটো চালে দু' কৌটো জল। ও হ্যাঁ, চালটা আগে সামান্য হলুদ মাখিয়ে, কাগজে ছড়িয়ে, শুকিয়ে নিও কিন্তু।"

"ব্যস, এইটুকু?"

"হ্যাঁ। ছোট এলাচই সুবাস আনবে।"

"থ্যাঙ্কস মা।"

"ছোটুকে বলো, আমরা আশীর্বাদ জানিয়েছি।"

"বলব।"

"এনজয় করো দিনটা। রাখছি।"

ফোন ছাড়ার পর আবার মনখারাপ ভাবটা ফিরে আসছিল করবীর। খুব আশা ছিল, ছোটু অন্তত কোনও একদিন ফিরবে কলকাতায়। ছোটবেলায় মায়ের কী নেওটাই না ছিল ছোট। খাওয়া-বসা-শোওয়া, সব কিছুতে মা-মা। তখন বড্ড ঘ্যানঘেনে মনে হত ছোটুকে, এখন সেই স্মৃতিগুলোই বড্ড জ্বালায়।

বসার ঘরের দরজায় রূপসা, "বেরচ্ছি মাসিমা।"

করবীর অন্যমনস্কতা ছিঁড়ে গেল। বলল, "সাবধানে যেও। কাল যাদবপুরের দিকে কী সব গণ্ডগোল হয়েছিল না?"

"পলিটিক্যাল পার্টির মারামারি। ও তো রোজই হচ্ছে।"

"দেখো, ওসব বোমাবাজি-টাজির মাঝে পড়ে যেও না যেন। তোমরা না ফেরা পর্যন্ত আমি খুব চিন্তায় থাকি।"

"জানি মাসিমা। তাই তো দেরি হলে ফোন করে দিই।

"সম্পূর্ণা কী করছে? সেই ভোরবেলা থেকেই তো পড়ছে। ঘাড়ের উপর সেমেস্টার..."

"ও, হ্যাঁ। ওর তো বেরনো নেই। প্রিপারেটরি লিভ। ঘরেই থাকবে সারাদিন।"

"আমি তা হলে যাই?"

"এসো।"

সাড়ে এগারোটা নাগাদ করবীও বেরিয়ে পড়ল। গত সপ্তাহে একটা নিম্নচাপ মতো হয়েছিল, জোর বৃষ্টিবাদলা গেছে দু'দিন। মেঘ সরতেই শীতটা পড়তে শুরু করেছে। আজও ঝলমল করছে আকাশ, কিন্তু রোদ্দুরের কোনও তাপ নেই। মধ্যদিনের বাতাসেও হিমের নরম ছোঁয়া।

মিনিটদশেকের হাঁটা পথ। সাদা ম্যারাপ বাঁধা একতলা বাড়িটার সামনে এসে করবী থামল। তার ভোরবেলার সঙ্গীদের মধ্যে একমাত্র গীতাদির বাড়িতেই সে এসেছে আগে। গত বছর রবীন্দ্রজয়ন্তীতে একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠান করেছিলেন গীতাদি। কয়েকটা অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে এসেছিল, তারাই গান নাচ করল। সেদিনই তো করবী শুনল, রিটায়ারমেন্টের পরেও উল্টোডাঙার রেল-লাইনের বস্তিটায় গীতাদি একটা স্কুলমতো গড়েছিলেন। বস্তির ছেলেমেয়েদের পড়াতেন, আঁকা শেখাতেন। প্রায় একা হাতে গীতাদি ছেলেদের মানুষ করেছেন বটে, কিন্তু নিজেরও একটা সমান্তরাল জীবন বজায় রেখেছেন বরাবর। তাই না কখনও একা হননি। শেষের দিকে কয়েকটা বছর আর শরীরে কুলাত না, ঘরবন্দি হয়ে পড়েছিলেন খানিকটা। তবে মনটা যে বন্দি হয়নি, দিব্যি টের পাওয়া যেত কথাবার্তায়।

ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে করবী ঢুকল বাড়িটায়। অনেক লোক ঘোরা-ফেরা করছে। ফুল আর ধূপের সুগন্ধে বাড়ি ম' ম'। শ্রাদ্ধের জায়গায় গিয়ে করবী গোড়ের মালাটি গীতাদির ছবির সামনে রাখল। বৈমানিক ছেলেটি বসেছে কাজে। করবী মিনিটখানেক সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ধীর পায়ে সরে এল। প্রভাতী সঙ্গীরা সকলেই প্রায় উপস্থিত। বিশাখা, তপতী, সুজাতা, সীমা মিলে

ছোট্ট একটা জটলা। সরোজার সঙ্গে সবাই কথা বলছে নিচু গলায়।

করবী চেয়ার টেনে বসতেই বিশাখা প্রায় ফিসফিস করে বলল, "গীতাদির বড় ছেলে তো এল না?"

"কেন?"

"সে নাকি লন্ডনেই মায়ের কাজ করবে।"

সুজাতা টুকুস মন্তব্য জুড়ল, "তারপর হয়তো নেড়ামাথা ছবি ফেসবুক-টুকে আপলোড করে দেবে। দুনিয়াসুদ্ধু লোক জানবে ছেলে কত মাতৃভক্ত!"

গীতাদির কথাটাই হঠাৎ মনে পড়ল করবীর। মানুষের খারাপটা দেখতে নেই...ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, "ওভাবে বলছ কেন? হয়তো তার কোনও জরুরি কাজ পড়ে গেছে।"

"বলা সহজ ভাই। কিন্তু ভেবে দেখো, তুমি মরে গেছ, তোমার ছেলে মায়ের মরা মুখটাও দেখতে এল না..."

বুকটা ধক করে উঠল করবীর। সে বা অনুব্রত মারা গেলে ছোটু হয়তো এড়াতে পারবে না, কিন্তু রাজা যে আসবেই, তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়? তবে এ-ও তো সত্যি, মরা মানুষটা তখন সুখ-দুঃখের ওপারে।

সুজাতা ফের বলছে, "কাজ-টাজ তো বাহানা। মার উপর টান থাকলে ছেলে ঠিক আসে। যেমন ছোট ছেলেটির আছে। খবরটা যখন পেল, তখন নাকি প্লেন নিয়ে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে। ওখান থেকে জানাল, 'পিস হ্যাভেনে বডি রাখো আমি গেলে পোড়ানো হবে।' ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে এসেও তো গেল।"

সীমা চোখ ঘুরিয়ে বলল, "সরোজার মুখে যা শুনলাম, সে নাকি আরও সেয়ানা। বাড়িটা বেচবে বলে এসেই নাকি দালাল ফিট করেছে। দাদা আর ভাইয়ে নাকি কথাও হয়ে গেছে ফোনে-ফোনে।"

রাজা-ছোটুও নিশ্চয়ই এরকমই করবে? অনুব্রত-করবী কেউই ধরাধামে না থাকলে সল্টলেকের বাড়িটা তারা রাখবে থোড়াই। যা তাদের স্বভাবগতিক, প্রোমোটারের হাতে তুলে দেওয়াটাও বিচিত্র নয়। অনুব্রতর এত যত্নে তোলা বাড়ি, করবীর এত তিলে-তিলে গড়া গৃহ, অনুব্রত-করবীর মতোই বেবাক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, ভাবলেই বুকটা কেমন হু হু করে। তবু এটাই তো বাস্তব। গীতাদিও না বলতেন, 'আমি মরলেই আমার বাড়িটারও পরমায়ু ফুরোবে!'

সব বুঝেও শ্রাদ্ধবাসরে এই কুটকচালি পরিপাক করতে পারছিল না করবী। গীতাদিকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে এ যেন তাঁর স্মৃতিকেই অপমান। আশ্চর্য, শুধু গীতাদিকে নিয়েই সবাই কথা বলছে না কেন? শুধু মলিন পোশাক-আশাক পরা গোটাকয়েক ছেলেমেয়েই যা গীতাদির বড় ছবিটার সামনে গুটিসুটি মেরে বসে। করুণ মুখে। তাদের সমস্তরের নয়, সমবয়সি নয়, আত্মীয় তো নয়ই, সম্ভবত উল্টোডাঙা বস্তিরই কেউ। স্বার্থের সম্পর্ক নেই বলেই বুঝি গীতাদিকে ওরা ভালবাসে। মানুষটা মারা যাওয়ার পরেও। এই ভালবাসাটা নিজগুণে অর্জন করেছেন গীতাদি।

সরোজা খেতে ডাকছে। শ্রাদ্ধবাড়িতে পাত পেড়ে বসতে ভাল লাগে না করবীর, শুধু একটা সন্দেশ মুখে দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। হাঁটছে ধীর পায়ে। সাদা খোলের শাড়ির উপর কালো-লাল গুজরাতি চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে। গীতাদির দুই ছেলের সম্পর্কে চোখা-চোখা মন্তব্যগুলো এখনও বাজছিল কানে। ভাগ্যিস করবীর বড় পুত্তুরটির কথা তারা জানে না!

করবী নিজেও কি জানত? নেহাত শর্মিষ্ঠার সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল, তাই না টের পেল বড় ছেলেটি কী চিজ। বছরদেড়েক আগে এক বিকেলে করবী সল্টলেকের সিটি সেন্টারে গিয়েছিল। একা। পর্দার কাপড় কিনতে। দোকানের দর্জিটাকে মাপ-টাপগুলো বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসছে, সামনে শর্মিষ্ঠা।

দেখেই করবী চিনতে পেরেছে। তবু যেন একটা জড়তা কাজ করছিল। শর্মিষ্ঠাই সহজ সুরে বলল, "কেমন আছেন মা?"

"ভাল," করবীর স্বর ফুটল, "তুমি?"

"চলছে। শপিংয়ে এসেছেন বুঝি?"

"ওই আর কী...তা তুমি এখানে?"

"আমরা তো এখন সল্টলেকেই ফ্ল্যাট কিনেছি। বাবা মা, সবাই এখন এখানে। বিচিত্রা আবাসন," করবীর দৃষ্টি তার সিঁথিতে ঘোরাফেরা করছে দেখেই বুঝি শর্মিষ্ঠা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি আর বিয়ে-থা করিনি মা।"

করবী ঈষৎ অপ্রস্তুত। ঢোক গিলে বলল, "তা চাকরি-বাকরি কিছু করছ নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ। কলেজে পড়াচ্ছি।"

"কলকাতায়?"

"না, একটু দূরে। উলুবেড়িয়া।"

"ওরে বাবা, সে তো অনেকক্ষণ লাগে?"

"বাস-ট্রেন মিলিয়ে দু' ঘণ্টা। অভ্যেস হয়ে গেছে।"

করবী আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। তবু একটা প্রশ্ন কুনকুন করছিল মাথায়। জিজ্ঞেস করবে না-করবে না করেও ফস করে বলে ফেলল, "আবার বিয়ে করলে না কেন? এত সুন্দর দেখতে তুমি, অত গুণ..."

বাড়তি সৌজন্য নয়, শর্মিষ্ঠার সৌন্দর্যের স্তুতিটা তার মনে রাখার কথাও নয়, সত্যিই তো শর্মিষ্ঠা সুন্দরী। ঝাঁ-চকচকে রূপসী হয়তো নয়, কিন্তু চমৎকার মুখশ্রী। গায়ের রঙটিও টকটকে ফর্সা। শুধু মাথায় একটু খাটো, এই যা। তাও ওই খর্বতাও যেন ঢলঢলে মুখমণ্ডলের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে যায়। সেদিন তো তাকে দেখল আট-ন' বছর পর, প্রাক্তন পুত্রবধূটির রূপ তখনও একটুও টাল খায়নি।

করবীর প্রশ্নটায় বিব্রত হয়নি শর্মিষ্ঠা। সহজ স্বরে বলেছিল, "বিয়ে করতে আর ইচ্ছে করল না। বাবা-মায়ের বয়স হচ্ছে, আমার তো আর ভাইবোন নেই, তাই ওঁদের দেখাশোনা করছি।"

"তোমার বাবা-মা আছেন কেমন?"

"ঠিকঠাক। তবে একটু আপসেট, এই যা। মেয়ের অপ্রত্যাশিত ডিভোর্স হলে যেমনটা হয় আর কী!"

জবাবটা কোথায় যেন ফুটেছিল করবীকে। মনে পড়ল, মিউচুয়াল ডিভোর্সের মেয়াদ যখন চলছে, একদিন ফোন করেছিলেন শর্মিষ্ঠার বাবা। বলছিলেন, কোনওভাবে মিটমাট করিয়ে দেওয়া যায় কিনা। করবী কোনও উত্তর দিতে পারেনি। অনুব্রত বলেছিল, ছেলে-ছেলের বউয়ের ব্যক্তিগত সমস্যায় নাক গলানো তাদের শোভা পায় না। এ ছাড়া আর কী-ই বা বলবে? রাজা তখন ডিভোর্সের জন্য যা মরিয়া! শর্মিষ্ঠা ফিরে আসার মাসখানেকের মধ্যে সিডনি থেকে উড়ে এল, ঝড়ের গতিতে উকিলকে দিয়ে আপসি বিচ্ছেদের চুক্তি বানাল, তারপর কাগজপত্র কোর্টে জমা দিয়েই ধাঁ। জিজ্ঞেস করলে তখন একটাই উত্তর দিত রাজা, "উই আর মিসম্যাচ মা!" ঠিক ছ'মাস যেতেই আবার কলকাতায় এসে গাঁটছড়া ছিন্ন করে দিয়েছিল আইনমাফিক। তারপর তো ওখানে বিয়ে করল আইরিনকে, ঘর সংসারও তো করছে দিব্যি।

করবী সেদিন দ্বিধান্বিত স্বরে শর্মিষ্ঠাকে বলেছিল, "আমার বড় খারাপ লাগে, জানো..."

"কেন?"

"তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল...আমি তো তোমাকে পছন্দ করে এনেছিলাম!"

"তো? বিয়েতে তো একটা চান্স ফ্যাক্ট কাজ করেই।"

"তোমাদের একদমই বনিবনা হয়নি, তাই না?"

"বাদ দিন না ওসব পুরনো কথা।"

"তা নয়, আমার খুব অবাক লাগে কিনা। আমি তো আইরিনকে দেখেছি, ওর সঙ্গে মিশেওছি। অতি সাধারণ মেয়ে। আমি ভেবেই পাই না, রাজা তার সঙ্গে ঘর করতে পারছে, অথচ তোমার মতো ব্রাইট একটা মেয়ের সঙ্গে তার মিলমিশ হল না!"

"কিছু মনে করবেন না মা। ছেলেরা কি সত্যিই ব্রাইট মেয়ে পছন্দ করে? অন্তত যারা রাজর্ষি টাইপ?"

"কেন? রাজর্ষি কীরকম?"

"পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে আমার ইচ্ছে করে না মা। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, সে অতি আত্মসর্বস্ব। রাজর্ষির মধ্যে সভ্যতা-ভব্যতার লেশমাত্র ছিল না। আইরিনকে নিয়ে সর্বসমক্ষে এমন মাখামাখি শুরু করল, তা সহ্য করা যায় না। প্রতিবাদ জুড়তেই রাজর্ষির কী রূপ! সে আমার গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছে। মারতে-মারতে একদিন মাঝরাতে আমাকে বের করে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। যদি সেদিন পুলিশে যেতাম, আপনার ছেলেকে জেলে যেতে হত!"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না করবী। বিড়বিড় করে বলেছিল, "তুমি থাকতেই আইরিনের সঙ্গে...রাজা তোমায় মারধরও করেছিল?"

"এত বছর পরে রাজর্ষির নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমার কী লাভ?"

করবী ক্ষুব্ধ স্বরে বলেছিল, "তুমি আমাকে তখন বলনি কেন?"

"আমি আমার বাবা-মাকেও বলিনি। কী করতেন আপনারা? বদলে দিতে পারতেন ছেলেকে? নাকি সবার কাছে কেঁদে-কেঁদে বেড়ালে আমার মান বাড়ত?"

অপমানে-লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল করবীর। একটা আত্মধিক্কারও জাগছিল বুঝি। কী ব্যর্থ তার পরিশ্রম! জীবনে-হাজার হাজার ঘণ্টা ব্যয় করে, সর্বক্ষণ ছেলেদের গায়ে লেপটে থেকে থেকে, শেষমেশ ওই পদের বানিয়েছে? ছোটুও কি মনের মতো হয়েছে করবীর? ভাবলেই তেতো হয়ে যাচ্ছে মনটা। ছোটুর কাছেও তো এখন 'তোমাদের জীবন, তোমাদের জীবন...আমাদের জীবন, আমাদের জীবন'...ভাবতে করবীর আরও খারাপ লাগে, এই ছেলেদের কাছে সে বেঙ্গালুরুতে যায়, সিডনিতে পাড়ি জমায়, হেসে গল্প করে মোক্ষলাভের আনন্দ পায়। হায় রে, মা-বাবা হওয়ার কী যে জ্বালা! শর্মিষ্ঠার কথা সে কাউকে বলতে পারেনি। অনুব্রতকেও না। মনে

হয়েছে, এ যেন তার একার পরাজয়। নিজের ছেলের দুষ্কর্মের জন্য একা-একা পাপবোধ বয়ে বেড়াচ্ছে বুকে। এ-ও কি কম দুঃসহ!

আলোময় দুপুরটা কেমন বিবর্ণ লাগছে হঠাৎ। গুমোট মুখে বাড়ি ফিরল করবী। জিজ্ঞেস না করতেই প্রতিমা জানাল, সম্পূর্ণার আহার শেষ, অনুব্রত এখনও তারই অপেক্ষায়।

করবী খর গলায় বলল, "ঢং করে বসে থাকার কী আছে? এরপর তো কাঁই-কাঁই করবে, সময়ে লাঞ্চ হল না, ঢেকুর উঠছে..."

অনুব্রত সামান্য অবাক। বলল, "মেজাজ করছ কেন? পেট চুঁইচুঁই? শ্রাদ্ধবাড়িতে লুচি-ধোঁকার ডালনা সাঁটিয়ে এলেই পারতে!"

"আমি তোমাদের বাপছেলেদের মতো পেটসর্বস্ব নই।"

"যাঃ বাবা, হঠাৎ ছেলেরা এসে গেল কোত্থেকে?"

করবী জবাব দিল না। হাত ধুয়ে টেবিলে বসে গেছে। প্রতিমাকে বলল, "দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছিস কেন? নে, ভাতটা বাড়।"

খাওয়া শুরু করে অনুব্রত বলল, "তোমায় একটা খবর দেওয়ার ছিল। মাথা ঠান্ডা হলে বলব?"

"কী হয়েছে?"

"শুনলে কিন্তু আরও চটে যাবে। আমার গুণধর ছোট ভাগ্নে সামনের সপ্তাহে কলকাতা আসছে। বউ-বাচ্চাদের নিয়ে। দু'দিন থাকবে এবাড়িতে।"

"হঠাৎ?"

"পলুর ছোটমেয়েটার গলায় কীসব প্রবলেম হচ্ছে। কল্যাণীর ডাক্তার কলকাতার কোন ইএনটি-কে যেন রেফার করেছে। ব্যাটারা এক ঢিলে দুই পাখি মারার ধান্দা। মেয়ে দুটোকে চিড়িয়াখানা-মিউজিয়াম দেখাবে।"

"ও, তাতে আমি রাগ করব কেন? মামার বাড়িতে তো পলু আসতেই পারে।"

করবীর নিরুত্তর উত্তরে অনুব্রত থ! চোখ গোল-গোল করে বলল, "মানে? থাকবে কোথায়?"

"রাজার ঘরখানা আছে কী করতে?"

"ওখানে তো তুমি ছোটুর মাল ঢুকিয়েছ। নড়াচড়ার জায়গাই নেই, সেখানে চার-চারজন..."

"ও হয়ে যাবে। মেয়েদের নিয়ে খাটে শোবে বউ। আর পলু নয় বাইরের ঘরের ডিভানে।"

"বাড়িটার কী দশা করে ছাড়বে বুঝতে পারছ? এমন নির্বোধ ছেলে...আমি যে ওদের আসাটা চাইছি না, সেটা পর্যন্ত আমার ডায়ালগ শুনে বুঝল না!"

"বুদ্ধি কম ঠিকই। বদ তো নয়। বাপ-মায়ের সেবাযত্ন তো করে।"

"সে কি এমনি-এমনি? লালুর মতো একটা স্কুলমাস্টারিও যদি জুটত, দেখতে ভেগে গেছে। ব্যাটার চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হল, এখনও একটা পাকা চাকরি নেই, মিল্ক কলোনিতে ক্যাজুয়াল খাটছে...জামাইবাবুর পেনশনটা আছে বলেই না গুষ্টিসুদ্ধ সকলে তাও দু' বেলা দু' মুঠো অন্ন পায়। বাপ-মাকে ছেড়ে নড়ার উপায় আছে হতভাগার! সেপারেট হয়ে গেলে মাথার উপর ছাদই তো থাকবে না।"

"যাই বলো, পলুর প্রাণে খুব মায়াদয়া।"

"হুঁঃ, ঠেলার নাম বাবাজি। নইলে জামাইবাবুর ওইটুকু বাড়িতে গাদাগাদি করে থাকত?"

"তবু আছে তো। যাদের নিয়ে তুমি জাঁক করতে, তারা কোন স্বর্গে তোমার বাতি দেবে শুনি?"

"যতই বল, আমার ছেলেরা কেউ অপোগণ্ড নয়।"

"বোকো না। ওদের একটাও যদি পলুর মতো আকাট হত, বর্তে যেতে। বুঝলে?"

আরও ক্ষিপ্ত হতে গিয়েও অনুব্রত নিভে গেল যেন। মাথা নামিয়ে খাচ্ছে চুপচাপ। শেষপাতে টোম্যাটোর চাটনিটা ছুঁলই না। উঠে চলে গেল শোওয়ার ঘরে। এবার বোধ হয় দিবানিদ্রা দেবেন!

করবী বসার ঘরে গিয়ে খবরের কাগজ উল্টোচ্ছিল। পড়ার মতো তেমন কিছুই নেই। শুধু এখানে আন্দোলন, ওখানে বিক্ষোভ, সেখানে মারামারি... সরকার যেন ধুঁকছে। ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করেছে এক চাষী। কোনও মানে হয়? বিয়ের আসরে কনেকে শাসাতে গিয়ে প্রেমিক গ্রেফতার। ধন্য প্রেম! মুম্বইয়ের পতিতাপল্লী থেকে চারটে নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করে আনল পুলিশ। উফ, কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে দুনিয়াটা! খবরের কাগজটা রেখে দিল করবী। টিভির রিমোটখানা হাতে নিয়েও নিল না কী ভেবে। পায়ে-পায়ে এসেছে রূপসা-সম্পূর্ণাদের দরজায়। টক-টক টোকা দিল। সাড়াশব্দ নেই। সন্তর্পণে ঠেলল পাল্লা। এ কী, মেয়েটা তো চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে। টেবিলে খোলা বইয়ে মাথা রেখে!

করবী একটুক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল সম্পূর্ণাকে। মুখটা সামান্য হাঁ, বাচ্চা মেয়েদের মতো। দেখলে ভারী মায়া জাগে।

করবী গলা খাকারি দিল, "অ্যাই মেয়ে, বিছানায় গিয়ে শোও না।"

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠেছে সম্পূর্ণা। হাতের পিঠে ঠোঁট মুছল তাড়াতাড়ি। পড়া ফাঁকি দিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া ছাত্রীর মতো বলে উঠল, "চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল!"

"চোখের আর কী দোষ, অ্যাঁ? সারাক্ষণ বইয়ে মুখ গুঁজে থাকলে ক্লান্তি তো আসবেই," সম্পূর্ণার পিছনটায় এসে দাঁড়াল করবী। পিঠে হাত রেখে বলল, "একটু রেস্ট নাও।"

"না মাসিমা, বিশ্রাম কী করে নেব? মঙ্গলবার থেকে পরীক্ষা, এখনও কিচ্ছু প্রিপারেশন হয়নি।"

"যাঃ, তুমি তো মোটেই ফাঁকিবাজ নও। রোজই পড়শোনা কর।"

"তবু হচ্ছে না মাসিমা। ফার্স্ট সেমেস্টারের সিলেবাস যা লেনদি! কী করে যে শেষ করব!"

"অত ঘাবড়ানোর কী আছে? চারখানা তো সেমেস্টার, একটা সেমেস্টারে এক-আধটা পেপার খারাপ হয়ে গেলে এমন কিছু সর্বনাশ হবে না। অন্য পেপারে মেকআপ করে নেবে।"

"না মাসিমা, রেজাল্ট খারাপ হলে বাবা বড় দুঃখ পাবে," সম্পূর্ণার মুখ ম্লান দেখাল, "এমনিতেই বাবার মন-টন খারাপ হয়ে আছে।"

"কেন গো?"

"গত সপ্তাহে খুব বৃষ্টি হল... সব পাকা ধান ক্ষেতে নষ্ট হয়ে গেছে।"

"ওমা, সে কী কথা?"

"হ্যাঁ মাসিমা। এই চাষটার উপর বাবা ভীষণ আশা করেছিল। বোরো চাষেও এবার মার খেয়ে গিয়েছিল কিনা। তার উপর গত বছর আলুর ফলন তো খুব বেশি হল, তাই আলুতেও একদম দাম পায়নি।"

সম্পূর্ণার সমস্যাটা একটু বোঝার চেষ্টা করল করবী। জিজ্ঞেস করল, "ধান না হলে তোমাদের তো চালও থাকবে না।"

"তা নয়। সারা বছরের খাওয়ার চাল মোটামুটি থাকে। ধানের গোলাও একেবারে ফাঁকা হয়নি। কিন্তু এ ধানটা বেচতে পারলে বাবার হাতে কিছু টাকাপয়সা আসত।"

"তোমাদের মোট কতটা জমি?"

"একেবারে সঠিক বলতে পারব না। এই ধরুন, বিশ-বাইশ বিঘের মতো। তার মধ্যে কিছুটা অবশ্য বর্গা দেওয়া আছে।"

"বর্গা মানে তো ভাগচাষ? মানে ধান ভাগাভাগি হয়?"

"হ্যাঁ। তবে চাষের খরচটা আমাদেরই জোগাতে হয়। বীজ, সার, কীটনাশক..."

"সে যাই বলো, বিশ-বাইশ বিঘে কিন্তু কম নয়। আমাদের এই বাড়িটায় কতটুকু জমি আছে জান? মাত্র পাঁচ কাঠা। তাও তোমার মেসোমশাই সেই প্রথম দিকে কিনেছিল বলে সস্তায় পেয়েছে!" করবী হাসছে, "আমাদের তুলনায় তোমরা তো জমিদার গো!"

সম্পূর্ণাও হেসে ফেলেছে। বলল, "মাসিমা, ওভাবে হিসেব হয় না। আমাদের, মানে, চাষিদের ঘরে নগদ টাকা বেশি থাকে না। কিন্তু খরচাপাতি তো সব নগদেই করতে হয়। চাষবাসের খরচ তো আজকাল কম নয়। এই তো, ডিজেলের দাম বাড়ল, ট্র্যাক্টরের ভাড়াও বেড়ে গেল," বলতে-বলতে সম্পূর্ণার গলা নামল, আমার পিছনে কত টাকা যাচ্ছে মাসে-মাসে। ভাইয়া এবার হায়ার সেকেন্ডারি দেবে, দু'-দু'জন স্যারের কাছে টিউশন পড়ে, তার খরচ আছে। তা ছাড়া আমাদের সংসারও তো খুব ছোট নয়। দাদু-ঠাকুরমা পিসি..."

"তোমার পিসিও থাকে সঙ্গে? কেন, তার বিয়ে হয়নি?"

"হয়েছিল। নেয় না শ্বশুরবাড়িতে," সম্পূর্ণা একটু চুপ থেকে চোখ নামিয়ে বলল, "দেনাপাওনা নিয়ে গন্ডগোল হয়েছিল তো, গয়নাগাটি কেড়ে রেখে ভাগিয়ে দিয়েছে।"

"ও!"

"তাই তো বলছি, ধানটা গিয়ে বাবার বড্ড ক্ষতি হয়ে গেল। এখন যদি আমি স্কলারশিপটাও না পাই, কীভাবে যে পড়াশোনার খরচ চলবে! এম এসসি-টা হয়তো শেষই করতে পারব না।"

"অত ভয় পাচ্ছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে," করবী আলগা চাপ দিল সম্পূর্ণার কাঁধে, "তা মাস্টার ডিগ্রিটা করে নিশ্চয়ই রিসার্চ-টিসার্চ করবে?"

"যদি সুযোগ পাই।"

"পাবে, পাবে। তুমি যথেষ্ট ব্রিলিয়ান্ট। চেষ্টা-চরিত্র করলে তুমি বিদেশেও চলে যেতে পার।"

"অত ভাবি না। এখানে যদি কোনও কলেজ-টলেজে প্রোফেসারি পাই..."

সম্পূর্ণার সঙ্গে আলাপচারিতা আজ বেশ ভাল লাগছিল করবীর। এমনিতে

তো তেমন একটা কথা বলে না, আজ যেন খানিক মুখর হয়েছে। করবী খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানছিল তার বাসনা, তার স্বপ্ন... প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসছে তার গ্রাম, দিঘি, বটতলা, সন্ন্যাসীর থান, সরু নদী...মনটা তর হয়ে যাচ্ছিল করবীর। ভেতরের জ্বালাপোড়াটা যে জুড়িয়ে আসছে ক্রমশ। কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে, আলো কমে গেছে পুবমুখো ঘরের। সম্পূর্ণা টিউবলাইটটা জ্বালাতেই করবীর হুঁশ ফিরল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এই দেখো, তোমার অনেকটা সময় নষ্ট করে দিলাম।"

"না, না, আমারও মাথা খানিকটা হালকা হল।"

"বটে? তা হলে মনের আনন্দে রসায়নে ফের সাঁতার কাটো। আমি চা-টা পাঠিয়ে দিচ্ছি!" বলে করবী দরজার দিকে যাচ্ছিল, কী ভেবে আবার ফিরে এসেছে। গলা নামিয়ে সম্পূর্ণাকে জিজ্ঞেস করল, "সেই পাজিটা আর তোমায় ফোনে জ্বালাতন করছে?"

যেন চমকে উঠল সম্পূর্ণা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না।"

"তুমি খুব নার্ভাস হয়েছিলে, বুঝতে পারি। নইলে সিমকার্ড পাল্টাতে না।"

সম্পূর্ণা নীরব।

করবী ফের জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটা কে, অ্যাঁ? কলকাতায় এসে আলাপ হয়েছে? তোমাদের ইউনিভার্সিটির কেউ?"

"নাঃ।"

"তোমাদের দেশের ওদিকের কেউ?"

সম্পূর্ণা জোরে-জোরে মাথা নাড়ল।

"কে তা হলে? তোমার অপরিচিত যে নয়, সে তো তোমার সেদিনের কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি।"

সম্পূর্ণা ঘাড় নামিয়ে নিল। মুখচোখে গভীর অস্বস্তি। বোঝাই যায়, প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইছে।

করবী আর চাপাচাপিতে গেল না। কিন্তু সামান্য শক্ত গলাতেই বলল, "বলতে না চাও, বোলো না। শুধু একটা কথা জানিয়ে রাখি, পড়াশোনা করতে এসেছ, আজেবাজে কোনও ব্যাপারে না জড়ানোই মঙ্গল। আর হ্যাঁ, এবাড়িতে থেকে তুমি কোনও নষ্টামি করবে, তা কিন্তু আমি বরদাস্ত করব না। তুমি ভাল মেয়ে, তোমাকে আমি ভালবাসি, স্নেহ করি...আশা করব, তুমি তার সুযোগ নেবে না। তাহলে কিন্তু আমার অন্য রূপও দেখবে।"

করবী মনে-মনে বলল, আমার যে রূপটা অনেক বছর আগেই দেখানো উচিত ছিল। কিন্তু আমি পেরে উঠিনি!

"শয়তান, ভণ্ড, চিটিংবাজের দল। সব ক'টাকে ধরে-ধরে গায়ে জলবিছুটি লাগাতে হয়।"

"লাগাও তো সবাই বলে মৈত্রমশাই। কিন্তু জলবিছুটি মাখানোর লোক আছে দেশে? সকলেরই তো পাছায় গন্ধ।"

"তা বলে খোলাখুলি ডাকাতি করলেও কোনও সাজা হবে না? দিব্য পুচ্ছটি নাচিয়ে ঘুরে বেড়াবে? প্রকাশ্যে?"

"কেন নয়? টাকা, মাসল পাওয়ার, পলিটিকাল খুঁটি, সবই যখন আছে? কার সাধ্যি ওদের ছোঁয়!"

অনুব্রতদের বিকেল-সন্ধের আড্ডা আজ জমে উঠেছে জোর। দেশের রাজধানীতে একটা কয়েক হাজার কোটি টাকা তছরুপের স্ক্যান ফাঁস হয়েছে। গতকাল সন্ধে থেকেই টিভিতে হইহই রইরই। খবরের কাগজেও আজ ওই আর্থিক কেলেঙ্কারি ফ্রন্টপেজ নিউজ। বড়-বড় কর্পোরেট হাউজ থেকে শুরু করে সরকারি কত রথী-মহারথীর নাম যে জড়িয়ে গেছে কিস্‌সায়। উঠে আসছে বিরোধী পক্ষের নেতাদের নামও। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর দিকেও আঙুল তুলতে কসুর করছে না সাংবাদিককুল। এমন একটা হাতে-গরম টপিক পেয়েও কি চুপ থাকতে পারে অনুব্রতরা?

তাপস, নির্মল, সমরেন্দ্র, সকলেই কম বেশি উত্তেজিত। তবে অনুব্রতর মতো কেউ নয়। হঠাৎ-হঠাৎ তেড়ে-তেড়ে উঠছে সে। কাল সন্ধে থেকে খবরটা পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখেছে অনুব্রত। চ্যানেল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। আড্ডাধারীদের কেউ সামান্যতম ভুল বললেই অমনি প্রতিবাদ জুড়ছে শির ফুলিয়ে। তার প্রতিটি মতামতই অত্যন্ত জোরালো। প্রায় চরমপন্থী গোছের।

সমরেন্দ্র প্রাক্তন ব্যাঙ্ক অফিসার। সে ঠাট্টা করে বলেই ফেলল, "আপনার কথা মানলে তো সবক'টাকে ফাঁসিতে লটকে দিতে হয় মৈত্র সাহেব!"

"আমার হাতে পাওয়ার থাকলে তাই দিতাম! সরকারি টাকা মানে পাবলিক মানি। আপনার-আমার ট্যাক্সের পয়সা। সেই টাকা যারা নয়ছয় করে..."

"আরে, সত্যি নয়ছয় করেছে কিনা সেটা তো প্রমাণসাপেক্ষ। এখন তো শুধু অভিযোগ উঠেছে," রিটায়ার্ড রেলকর্মী তাপস যুক্তি সাজাচ্ছে, "আর প্রমাণ করাটা কি সোজা? টাকা খরচ করে ঘ্যাম-ঘ্যাম লইয়ার লাগাবে।"

নির্মল ছিল ওষুধ কোম্পানিতে। সে কুট করে ফোড়ন কাটল, "আর উকিল-ব্যারিস্টাররা কেসটাকে স্লো পয়জনিং করবে। কোন সময়ে যে মামলাটা মরে ভূত হয়ে যাবে, টেরই পাবেন না। তারপর দেখবেন, সরকারি নথিপত্রও লোপাট! টপ টু বটম সকলে চুরির বখরা পায় কিনা। সততা, নৈতিকতা, শব্দগুলো এখন শুধু ডিকশনারির শোভা বর্ধন করে।"

সত্যি, পুরো দেশটাই যেন গলে পচে নষ্ট হয়ে গেছে। কোথাও একটু আলো নেই? মনে হলেই রগ দুটো দপদপ করে অনুব্রতর। সিস্টেমটা এমন, কাউকে ভাল থাকতে দেয় না। যখন অনুব্রতরা শিবপুরে পড়ত, চোখে কত আদর্শ ছিল। সবে দশ-পনেরো বছর আগে স্বাধীন হয়েছে দেশ, গড়ে উঠছে ভারী-ভারী শিল্প... হবু ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার অনুব্রত মৈত্র তখন ভাবত, সেও তার কারিগরি জ্ঞান নিয়ে শরিক হবে নির্মাণের। পাশ করে প্রাইভেট কোম্পানিতে তো যেতে পারত, কিন্তু ওরকম একটা স্বপ্ন নিয়েই না ঢুকেছিল ডিভিসিতে। তবু কী অবদানটা সে রেখেছে সেখানে? কিছুই না। স্রেফ থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় করে পরিণত হয়েছিল একটা নাটবল্টুতে। চারদিকে দুর্নীতি, গা কিচকিচ করছে, কিন্তু অনুব্রতর ঠোঁটে কুলুপ আঁটা। কেন রুখে দাঁড়ায়নি? সংসার সন্তানদের জন্য? তাদের চন্দ্রপুর প্ল্যান্টের বারীন শিকদার হইচই জুড়েছিল। ঠিকাদার নিম্ন মানের মাল সরবরাহ করছে বলে। বেমক্কা খুনই হয়ে গেল বারীন। দামোদরের ধারে পাওয়া গেল তার লাশ। প্ল্যান্টের সবাই বলল, বারীন একটা আহাম্মক। ঠিকই তো। অনুব্রত কেমন বুদ্ধিমানের মতো নির্বিবাদে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিল জীবনটা। টপাটপ প্রমোশন পেল, এখন মোটা পেনশান নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে যাপন করছে অবসরজীবন।

তবু বিবেকটা কুট-কুট কামড়ায় যে! সাধে কি ক্ষোভে ফেটে পড়ে অহরহ! ওই রাগ ঘেন্নার বেশ খানিকটা কি নিজের ওপরেও নেই?

প্রসঙ্গ বদলে গেছে আড্ডার। অলস নিষ্ফলা গুলতানির এটাই তো দস্তুর। আর্থিক দুর্নীতি থেকে রাজ্য রাজনীতি, সেখান থেকে ক্রিকেট ফুটবল টেনিস, পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে বিষয়। শেষমেশ এল আবহাওয়া। এবার মাঘের গোড়াতেই শীত কেমন কমে গেল, তাই নিয়েও জোর চাপানউতোর। কারওর মতে, এ গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফল, কয়েক বছর পর শীত ঋতুটাই নাকি আর থাকবে না। কেউ বা তর্জনী নেড়ে বলছে, দু'-চারদিনের মধ্যে নাকি বৃষ্টিবাদলা হবে, তারপর ফের ফিরে আসবে হাড়কাঁপানি। অসুখ-বিসুখের আশঙ্কায় তো রীতিমতো উদ্বিগ্নই হয়ে পড়ল নির্মল। তাই শুনে সকলের কী হা হা হাসি!

সাতটা নাগাদ ভঙ্গ হল জমায়েত। নিয়মমতো। পার্ক থেকে বেরিয়ে সমরেন্দ্রর সঙ্গে হাঁটছিল অনুব্রত। সমরেন্দ্র বড্ড শীতকাতুরে, এখনও কম্ফর্টারে জড়িয়ে রেখেছে গলামাথা। অনুব্রতও সাবধানী, ফুলস্লিভ সোয়েটার এখনও ছাড়েনি, শুধু টুপিখানাই যা নেই।

আলো-আঁধারি পথ ধরে চলতে চলতে সমরেন্দ্র একটা সিগারেট ধরিয়েছে। প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "চলবে নাকি?"

"নাঃ।"

"ঠান্ডায় মন্দ লাগবে না কিন্তু। পুরনো আমেজটা ফিরে পাবেন।"

"না বোসদা। আমি যা ছাড়ি, চিরকালের জন্যই ছাড়ি।"

"আরে, এক-আধটা খেলে কিছু হয় না। তা ছাড়া ছেড়ে দিয়ে ধরার মজাটাই আলাদা। মনে হবে, দীর্ঘ বিরহের পর গিন্নি আবার ফিরে এল! দুটোই তো নেশা, কী বলেন?" নিজের রসিকতায় নিজেই হাসছে সমরেন্দ্র। হঠাৎই কনুই দিয়ে ঠেলল অনুব্রতকে, "দেখুন, দেখুন, কাণ্ডটা দেখুন।"

দৃশ্য বটে একখানা। রাস্তার ধারে মোটরবাইকের সিটে এক তরুণী পা ঝুলিয়ে বসে। একটি যুবক তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। ঘন-ঘন ঝুঁকছে তরুণটি, ঠোঁটে ঠোঁট মেলাচ্ছে দুজনে! চুমু খাওয়া-খাওয়িতে তারা এতই মগ্ন, পাশ দিয়ে যে লোকজন যাচ্ছে, ভ্রূক্ষেপই করছে না!

দেখনসুখ উপভোগ করার জন্যই বুঝি চলার গতি শ্লথ হয়েছিল অনুব্রত আর সমরেন্দ্র। যুগলকে পেরিয়ে ঘুরে-ঘুরে তাকাচ্ছে সমরেন্দ্র। বিরক্ত গলায় বলল, "ছি, ছি, কী অসভ্যতা! দেশটা বিলেত-আমেরিকা হয়ে গেল নাকি?"

অনুব্রতর হাসি পেল। শ্লেষের সুরে বলল, "সিনটা এনজয়ও তো করলেন দিব্যি।"

"মোটেই না। ওরা কদ্দুর বাড়তে পারে দেখছিলাম।"

"ওরা কতটা এগোলে আপনি খুশি হতেন?"

"হ্যাঃ, এমন রসিকতা করেন না..."

"রস এখনও পুরো মরেনি যে!" অনুব্রত হাসছে, "আমি আপনার মতো হিপোক্রিট নই। ইয়াং ছেলেমেয়ে...একটু বেসামাল হয়ে প্রেম করছে... দেখতে খারাপ লাগবে কেন?"

সমরেন্দ্রর বুঝি গায়ে লেগেছে। মুখে আর বাক্যিটি নেই। অনুব্রতর বাড়ির কাছাকাছি এসে থামল একটু। বলল, "চলি। কাল দেখা হবে।"

"যদি বেঁচে থাকি।"

"যাঃ, কী যে আজেবাজে বলেন!"

"আরে বোসদা, এখন জীবনের প্রত্যেকটা দিনই নিউ লিজ অফ লাইফ। পরদিন লিজটা রিনিউ হবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা আছে...গুড নাইট।"

সমরেন্দ্রকে চটিয়ে দিতে পেরে মন সামান্য ফুরফুরে হয়েছিল অনুব্রতর। দোতলায় উঠে হালকা চিড়। টিভি দখল হয়ে গেছে, সেই অখাদ্যে অনন্ত মেগা সিরিয়ালটা গিলছে করবী আর প্রতিমা। কে বলবে মালকিন আর পরিচারিকা? ঠিক যেন দুই সখীটি! নাঃ, মেগাই বোধ হয় পারবে শ্রেণিহীন সমাজ গড়তে!

জামাপ্যান্ট বদলে গায়ে একটা শাল জড়িয়ে বাইরের ঘরে ঢুকিল অনুব্রত। গুছিয়ে সোফায় বসে প্রতিমাকে বলল, "কী রে, এবার আমি কি একটু চান্স পাব?"

করবী জবাব দিল, "আর পাঁচ মিনিট। লাস্ট পার্টটা চলছে।"

"মেগার আবার লাস্ট বলে কিছু হয় নাকি? এ তো এক অন্তহীন প্রক্রিয়া! প্রায় রেডিওঅ্যাক্টিভিটির মতো। আলফা গামা বিটা পার্টিকলরা বেরোতেই থাকে, বেরোতেই থাকে।"

"এই, টিজ কোর না তো। দেখছি, দেখতে দাও।"

"বাধা দিয়েছি নাকি?" বলেই অনুব্রতর চোখ সরু, বউটা আজ অমন মিইয়ে আছে কেন? সেদিন খুব দাপাচ্ছিল দেখলাম। কোনও কেস খেয়েছে?

"ওর বর আর একটা মেয়েকে ভালবাসে। ও জানতে পেরেছে।"

"সো হোয়াট? নিজে একখানা ইয়ে শুরু করে দিক।"

"আঃ, থামবে?"

"ভাল পরামর্শই তো দিচ্ছি," অনুব্রত খুনসুটি জুড়েছে, "ভেবে দেখো, ওর একটা নতুন সম্পর্ক মানে গল্পে একটা নতুন মোচড়। যেমন ধরো, তোমার এক ধরনের অভ্যস্ত লাইফে হঠাৎ দু'খানা পেয়িং গেস্ট। তোমারও জীবনে নয়া টুইস্ট। রোজ সকালসন্ধে তাদের সঙ্গে গল্পগাছা করছ, কেউ একজন হাঁচলে-কাশলে তার জন্য উতলা হয়ে পড়ছ...সম্পূর্ণা সেমেস্টার এগজাম দিল। মনে হল, তোমারই যেন পরীক্ষা চলছে। মেয়ে দুটো বড়দিনে বাড়ি পর্যন্ত গেল না, কোথায় তাদের ঠেলেঠুলে বাপ-মার কাছে পাঠাবে তা নয়, তুমি কেক বানিয়ে খাওয়াচ্ছ!"

করবী ঝাঁঝিয়ে উঠল, "বেশ করেছি। হাজার বার করব।"

"করো না। কে তোমায় বাধা দিচ্ছে? বরং আমার তো লাভই লাভ। আবার তোমার স্বহস্তে বানানো দু'-চারটে সুখাদ্য খেতে পারছি। শেষ কবে কেক বানিয়েছিলে, স্মরণে আছে? ছোটু তখনও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেনি... ওর জন্মদিনে। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি ওসব বানাতে পার!" বলেই অনুব্রতর ফের খোঁচা, "তা পিঠে-পায়েসই বা করলে না কেন? কিংবা ক্ষীরের মালপোয়া? পৌষ সংক্রান্তি তো পেরিয়ে গেল।"

"ওফ, কানের পোকা নড়িয়ে দিল!" করবী ঝনঝনিয়ে উঠল, "এই বয়সেও কী নোলা!"

"যাঃ বাবা, নিজের জন্য বলেছি? তোমার মেয়েরাই তো খেত। আর মাসিমার জয়গান গাইত। আমি তো বড় জোর এক-আধটুকরো...প্রসাদ হিসেবে..."

"বুঝেছি। বাজার থেকে কাল চালের গুঁড়ো এনে দিও। সঙ্গে খোয়া ক্ষীর। আর প্রতিমা, সকালে বেশি করে দুধ ধরিস তো।"

প্রতিমা মিটিমিটি হাসছিল। ঘাড় নেড়ে দিল ঢক করে। ওদিকে টিভিতে এপিসোডও শেষ, করবী রিমোটখানা ছুঁড়ে দিল অনুব্রতর কোলে। বলল, "এবার প্রাণের সুখে নেতাদের ঝগড়াঝাঁটি দেখ। আমি কিন্তু আবার সাড়ে আটটায়..."

"জানি, ছেড়ে দেব।"

প্রতিমা উঠে গেল ঘর থেকে। অনুব্রতর সান্ধ্য পানের জোগাড়যন্ত্র করতে। রিমোট টিপে খবরের চ্যানেলে ঢুকল অনুব্রত। সেই স্ক্যাম নিয়েই রগড়ারগড়ি চলছে। একটুক্ষণ দেখে অনুব্রত আর একটি সংবাদের চ্যানেলে গেল। সেখান থেকে আর একটা।

অনুব্রতর ঘন-ঘন চ্যানেল বদল করবীর দু'চক্ষের বিষ। বিরক্ত হয়ে সোফা ছাড়ছিল, হঠাৎই চিত্রার্পিত।

অনুব্রতরও দৃষ্টি গেঁথে গেছে পর্দায়। রূপসা সাক্ষাৎকার দিচ্ছে এক সাংবাদিককে।

সাংবাদিক, "আপনি তা হলে বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপনাদের কনভেনশন করার অনুমতি দিয়েছিলেন?"

রূপসা: "অবশ্যই। আমাদের আবেদনের বেসিসে রেজিস্ট্রার পারমিশন দিয়েছিলেন। তাঁর সই করা পেপার আছে আমার কাছে। চাইলে ডিসপ্লেও করব।"

সাংবাদিক: "কনভেনশনটা যে বানচাল হয়ে গেল, সে ব্যাপারে আপনার কী বক্তব্য?"

রূপসা: "আমি খুব ব্যথিত। যাঁদের বক্তব্য রাখার কথা ছিল, তাঁরাও যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ভেবে খুব খারাপ লাগছে, রাষ্ট্রীয় হিংসার সমালোচনা করার অধিকারও যেন আমাদের নেই। বারবার আমাদের হিউমিলিয়েট করা হচ্ছে। ইউনির্ভাসিটি ক্যাম্পাসের ভিতরেই।"

সাংবাদিক: "এই কারণেই নাকি গত বছর আপনাকে বাড়ি বদল করতে হয়েছে?"

রূপসা: "হ্যাঁ। লাস্ট জুলাইতে। সরকারি দমন-পীড়নের প্রতিবাদ করেছিলাম, তাই আমাকে ভয় দেখানো হয়েছিল।"

সাংবাদিক: "কারা ভয় দেখিয়েছিলেন?"

রূপসা: "স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। তাঁদের চেলাচামুণ্ডারা।"

সাংবাদিক: "এখন যেখানে আছেন, সেখানে কি কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে?"

রূপসা: "এখনও পর্যন্ত তো নয়। ভবিষ্যতে কী ঘটবে, ভবিষ্যৎই জানে।"

সাংবাদিক: "শেষ প্রশ্ন। এই যে ঘটনাটি ঘটল, তার পরবর্তী পদক্ষেপ কিছু ভেবেছেন?"

রূপসা: "না। তবে আমাদের যে মুখ বন্ধ রাখা যাবে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

সাংবাদিকের বুম সরে গেল। রূপসাও অদৃশ্য পট থেকে। এখন নতুন মুখ, নতুন খবর।

অনুব্রত আর করবী চোখ চাওয়াচায়ি করছে। দু'জনই যেন বাকরহিত।

করবীই স্বর ফুটল প্রথমে। বিড়বিড় করে বলল, "পিছনে ওটা ইউনিভার্সিটির গেট না?"

"তুমি ওই দেখছিলে?" অনুব্রত খিঁচিয়ে উঠল, "আমাদের যে সর্বনাশটা ঘটে গেছে, সেটা টের পাচ্ছ কী?"

"কেন?"

"ভগবান কি মগজে ঘিলু বস্তুটি একেবারেই দেয়নি? বুঝতে পারছ না, কী চিজ ঢুকিয়েছ ঘরে?"

করবী মাথা নাড়ল। সত্যি যেন সে বুঝতে পারছে না।

অনুব্রত রুক্ষ গলায় বলল, "আগুনের খাপরা। টেররিস্ট।"

"কী করে বলছ?"

"আশ্চর্য! নইলে কি এমনই-এমনই ইউনিভার্সিটি মিটিং বন্ধ করে দেয়? যে-রাজনীতি জিনিসটা আমি সব চেয়ে অপছন্দ করি, সেটাই কিনা ঢুকল বাড়িতে?" কটমট চোখে করবীর পানে তাকাল অনুব্রত, "তোমার জন্য। সব তোমার জন্য!"

"আমি কী করলাম? আমি কী জেনেশুনে..."

"জাননি কেন? অচেনা, অজানা মেয়েকে বাড়িতে ঢোকানোর আগে ভাল করে খোঁজ নেবে না? অন্য মেয়েটার বাপকে তা-ও দেখা গেছে, এর তো কারওর দর্শনই পেলাম না!"

"বাড়ির ঠিকানা তো দিয়েছিল। বাবা-মায়ের মোবাইল নাম্বারটাও... তুমি তো ওর বাবার সঙ্গে কথাও বলেছ।"

"ব্যস, তাতেই হয়ে গেল? ফোনের ওপারে কে ছিল, কী করে বোঝা যাবে? ঠিকানাটাও কি ভেরিফাই করেছ?" অনুব্রত মাথা দোলাচ্ছে, "ক্যালাস, ক্যালাস, এক্কেবারে ক্যালাস! কী অশান্তি যে নাচছে কপালে!"

"ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? রূপসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলো।"

"থাক, তোমার আর জ্ঞান দিতে হবে না!" অনুব্রত তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "তিনি কি আছেন ঘরে?"

"উঁহু। এখনও ফেরেনি।"

"ধরছি আমি। বলেই করবীর দিকে তর্জনী তুলল, "তুমি কিন্তু থাকবে সামনে। রাখবে, না তাড়াবে, ডিসিশনটা তুমিই নেবে।"

পানীয় রেখে গেছে প্রতিমা। একটু তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলল অনুব্রত। আবার ঢালল এক পেগ। চোখ টিভিতে, কিন্তু মন যেন অন্য কোথাও। পর্দার বাকবিতণ্ডা যেন ঢুকছেই না কানে। দ্বিতীয় পেগও সাফ, সরিয়ে রাখল গ্লাস বোতল। উঠে বাথরুমে গেল একবার। ফিরে আবার বসেছে সোফায়।

কোলাপসিবল গেটে শব্দ হতেই অনুব্রত টান-টান। ঘাড় ঘোরাল। হ্যাঁ, রূপসাই। চটি ছাড়ছে।

গলা ভারী করে অনুব্রত ডাকল, "শোনো।"

রূপসা দরজায় এসেছে, "কিছু বলছেন মেসোমশাই?"

"হ্যাঁ, বোসো এখানে। কথা আছে।"

অনুব্রতর স্বর শুনে রূপসা যেন একটু সচকিত। ঝলক দেখল করবীকে। তারপর গুটি-গুটি পায়ে তার পাশটিতে গিয়ে বসেছে। করবীকেই জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে মাসিমা?"

"উঁহু, মাসিমা নয়, আমার সঙ্গে কথা বলো," অনুব্রত গলা ঝাড়ল, "তুমি আমাদের মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলে কেন?"

"আমি? মিথ্যে?" রূপসার গলায় অকৃত্রিম বিস্ময়, "কই, না তো!"

"বললেই হবে? তোমার সম্পূর্ণ আইডেন্টিটি তো ডিসক্লোজ করনি? জানাওনি তো তুমি রাজনীতি কর?"

"আমি তো রাজনীতি করি না মেসোমশাই," রূপসার স্বর সহসাই দৃঢ়, "অতীতেও করতাম না। ভবিষ্যতেও করার কোনও বাসনা নেই।"

"গুলগাপ্পি মেরো না! তুমি কি বলতে চাও, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এমনই-এমনই তোমার পিছনে লেগেছে? তুমি কনভেনশন, না কী যে করতে যাচ্ছিলে, অকারণে সেটাকে স্টপ করে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ, মেসোমশাই। প্রায় তাই। স্রেফ পার্টির নেতাদের চাপে এই কাণ্ডটা ঘটাল। কারণ, আমরা কনভেনশনে যা বলতে চাইছিলাম, রাজনীতির লোকদের তা হজম হয় না।"

"কী এমন গুরুপাক কথা বলো তোমরা? বাই দা বাই, 'তোমরা'টাই বা কে?"

"আমরা কয়েকজন মিলে একটা স্টাডি সার্কল করেছি। নাম হয়তো শোনেননি। নবদিশা। যাদবপুর আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক আছেন নবদিশায়। আছে কিছু ছাত্রছাত্রী। আমার মতো দু'-চারজন রিসার্চ স্কলারও। প্লাস অন্য পেশারও কেউ-কেউ। ডাক্তার, লইয়ার...আমরা মূলত একটা ফ্রি থিঙ্কার গোষ্ঠী। তবে আমাদের মূল লক্ষ্য, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে প্রতিহত করা। নির্মূল করা। আজকের কনভেনশনটাও ছিল এই নিয়ে। আমাদের দুর্ভাগ্য, সুযোগ পেলাম না কথা বলার।"

অনুব্রত তেরচা চোখে করবীকে বলল, "দেখেছ তো, ইন্টারভিউটা শুনেই আমি ঠিক আন্দাজ করে ফেলেছিলাম?"

রূপসা সন্দিগ্ধ মুখে বলল, "আমাদের কী ভেবেছেন?"

"তোমরা যা, ঠিক তাই। নবদিশা না কী নাম, তার আড়ালে একটি জঙ্গি সংগঠন!"

"না, না, মেসোমশাই, একেবারেই তা নয়। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। আমরা শুধু রাষ্ট্রীয় হিংসাকে আটকাতে চাই। অকারণে কমন পিপলের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে চাই।"

"দেখো, বেশি বুলি কোপচিও না। কথার মারপ্যাঁচ যাই করো, আড়ালে কী আছে, আমি খুব বুঝি। তোমরাই তো তলে তলে..."

"আমাদের কোনও তলে-তলে নেই মেসোমশাই! আমরা কোনও গুপ্ত প্রতিষ্ঠান নই। সত্যি কথা বলতে কি, কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগও নেই। তেরঙা, গেরুয়া লাল... না, না, না।"

"আমাকে পট্টি পরাচ্ছ? আমি সব জানি। অকারণে তোমায় যাদবপুরের বাড়ি থেকে উৎখাত করেছিল?"

"কারণটা শুনবেন?" রূপসার ঠোঁটে একটা মিহি হাসির আভাস, "তারপর যদি আপনাদেরও ইচ্ছে হয় আমাকে উৎখাত করতে, আমি এক কথায় চলে যাব। টুঁ শব্দটি করব না।"

অনুব্রত তাকাল করবীর দিকে। একটু যেন ফাটল ধরেছে তার ভাবনায়। তবু নীরস স্বরে বলল, "আশা করি, কিছু লুকোবে না?"

"গোপন করার মতো কিছু তো নেই। মনে আছে নিশ্চয়ই বীরভূমে একটা স্টিল ফ্যাক্টরির জন্য জমি নিচ্ছিল সরকার? জোরজার করে? কম দামে?"

"হ্যাঁ, জানি। চাষিদের আপত্তি ছিল, গভর্নমেন্ট শোনেনি। গোলমালও তো হয়েছিল খুব। পুলিশ ফায়ারিং টায়ারিং..."

"আট-আটটা লোক মারা গিয়েছিল। অন দ্য স্পট। সরকারি এই অ্যাকশনের বিরুদ্ধে নবদিশা প্রতিবাদ সভা করেছিল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। আমরা লিফলেট ছেপে গোটা বিষয়টা জানিয়েছিলাম ছাত্রছাত্রীদের। বিশদে। চেয়েছিলাম, স্টুডেন্টদের মধ্যেও ওই ব্যাপারে একটা মতামত গড়ে উঠুক। আপনারাই বলুন, আমাদের কাজটা কি অন্যায়?"

"না, না, রূপসারা তো ঠিকই করেছে," করবী বলে উঠল, "লোকগুলো বেঘোরে মারা গেল, তার প্রতিবাদ হবে না?"

"অ্যাই, তুমি থামো তো!" করবীকে মৃদু ধমক দিল অনুব্রত। চশমার কাঁচের উপর দিয়ে দেখল রূপসাকে। ঈষৎ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, "তার মানে, তুমি বলতে চাও, পুলিশ ফায়ারিংয়ের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করার জন্য তুমি আগের বাড়ি থেকে গলাধাক্কা খেয়েছিলে?"

"উঁহু, আরও কিছু রিজন ছিল বই কী! রীতিমতো সলিড!" রূপসার স্বরে পলকা কৌতুক, ওই প্রোটেস্ট মিটিংয়ের সাত দিন পরে ছিল ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংসদের নির্বাচন। আমাদের এমনই কপাল, ওই মিটিং লিফলেটের কারণে কিনা কে জানে, হেরে ভূত হয়ে গেল শাসকদলের ছাত্রসংগঠন। অমনই রাগটা গিয়ে পড়ল নবদিশার উপর। আমি যেহেতু বক্তৃতা করেছিলাম, পার্টির টার্গেট হয়ে গেলাম আমি। তা ক্যাম্পাসের মধ্যে তো হেকল করা মুশকিল। চারদিকে খবর রটে যাবে, টিভি-নিউজপেপার গোল বাধাবে। সুতরাং রূপসাকে ডেরাতেই ধরো। আপনারা ভাবতে পারবেন না, পাড়ার ছেলেদের দিয়ে আমায় কী হেনস্থাটাই না করেছিল! আঙুল উঁচিয়ে শাসাচ্ছে, 'পাড়ার থাকতে গেলে টুঁ শব্দটি করা চলবে না...কোনও বেচালপনা দেখলেই লাইফ হেল করে ছেড়ে দেব...!' তার উপর বাড়িওয়ালার ছেলেটা ছিল লোকাল পার্টির পাণ্ডা। সে তো সকাল বিকেল বলছে, 'কাটো, কাটো, কেটে পড়ো...!' আপনারাই বলুন, কদ্দিন লড়াই করে করে সেখানে থাকা যায়। তখনই আপনাদের বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল, মাসিমাও আমায় অ্যাকসেপ্ট করলেন... নইলে যে কী বিপদে পড়তাম!"

"হুম," অনুব্রত সংশয়ী স্বরে বলল, "তুমি সত্যি বলছ?"

"সত্যি-মিথ্যে বিচারের ভার আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম। যা সিদ্ধান্ত নেবেন, মাথা পেতে নেব।"

দোটানায় পড়ে গেল অনুব্রত। চশমাটা খুলল একটু, শালের খুঁট দিয়ে মুছল। ফের লাগিয়েছে চোখে। জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের নবদিশা এগজ্যাক্টলি কী-কী কাজ করে?"

"ওই যে বললাম, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে ঠেকানো। কীভাবে সেটা করা সম্ভব, তাই নিয়ে আলোচনা।"

"শুধুই কথার ফুলঝুরি। তোমরা অ্যাকশন-ফ্যাকশন কিছুই কর না?"

"অবশ্যই করি। তবে সে অ্যাকশন নয় মেসোমশাই। বলতে পারেন অ্যাক্টিভিটি। যেমন ধরুন, মাঝে-মাঝে দল বেঁধে গ্রামে যাওয়া হয়। নবদিশা গ্রামের প্রান্তিক মানুষদের জানায়, দেশের নাগরিক হিসেবে কী-কী অধিকার তাদের প্রাপ্য এবং তা পেতে গেলে গ্রামবাসীদের কী করণীয়। যদি বাধা আসে, কীভাবে তা প্রতিরোধ করতে হয়..."

"বোমা-বন্দুক নিয়ে?"

"খুব একটা ভুল বলেননি মেসোমশাই। বোমা-বন্দুকে বিশ্বাসী লোক একেবারেই যে নেই নবদিশায়, তা আমি বলছি না। তবে সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস। তার সঙ্গে নবদিশার কোনও সম্পর্ক নেই। নবদিশা যে কোনও ধরনের হিংসার বিপক্ষে। মানুষের সচেতনতা বাড়ানোই আমাদের প্রধান কাজ।"

করবী চুপটি করে শুনছিল। জিজ্ঞেস করল, "তা তুমিও গ্রামেগঞ্জে যাও?"

"হ্যাঁ, গেছি তো। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া। সুন্দরবনের দিকেও গেছি। মানুষের যে কী অভাব, ভাবতে পারবেন না। এত অপুষ্টি, এত অসহায়তা...ওসব জায়গায় গেলে মনে হবে, শহরে আমরা যারা বিলাসী জীবনযাপন করছি, তারা রীতিমতো পাপিষ্ঠ!"

"হুম, তা দারিদ্র তো বুঝলাম, রাষ্ট্রীয় হিংসাটা আসছে কোত্থেকে?"

"এটাও কি আপনাদের বুঝিয়ে বলতে হবে মেসোমশাই? দেখছেন না আমাদের দেশটাকে? কী হিংসাটাই না চলছে। মাটির নীচের খনিজ সম্পদগুলোর দখল নেওয়ার জন্য কত লক্ষ-লক্ষ আদিবাসীকে যে ভাগানো হয়েছে তাদের আস্তানা থেকে! একেবারে কুকুরবেড়ালের মতো। অথচ সেখানে তারা হাজার-হাজার বছর ধরে বাস করছিল। তারপর ধরুন কলকারখানা গড়া, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি, কিংবা বাঁধ বানানো... যেগুলোকে আমরা বলি উন্নয়ন, তার জন্য কত লক্ষ মানুষকে যে ঘরবাড়ি, জমিজিরেত হারাতে হয়েছে, হিসেবই করা যাবে না। আর এসবই হয়েছে সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে। যেখানেই মানুষ আপত্তি জানিয়েছে, সেখানেই চলেছে গভর্নমেন্টের জোরাজুরি। নির্বিচারে খুনখারাপি, মেয়েদের উপর অত্যাচার, কী হয়নি!"

রূপসা খুব একটা ভুল বলছে না। ডিভিসি গড়ে ওঠার সময়েও তো কত কী ঘটেছে। মাইথন, পাঞ্চেত, চন্দ্রপুরা থেকেও তো কত আদিবাসীকে গরু-ছাগলের মতো খেদানো হয়েছিল। অবশ্য এটাই তো সভ্যতার নিয়ম। পৃথিবীর সব দেশেই তো উন্নয়নের ফাঁসিকাঠে বলি দেওয়া হয় আদিবাসীদের। আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানরা প্রায় মুছে গেল, অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাবঅরিজিনরা তো এখন প্রায় সংরক্ষিত প্রাণী। দেখেই তো এসেছে অনুব্রত। সিডনির ফুটপাথে ডিজিরিডু বাজিয়ে আধা ভিখিরির মতো কেমন পয়সা রোজগার করে বেচারারা। তবু ধন্দ যাচ্ছিল না অনুব্রতর। কড়া গলায় নয়, সহজ সুরেই রূপসাকে জিজ্ঞেস করল, "তা তুমি এসব চক্করে কেন? পিএইচডি করছ,

কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াবে, তা না করে এসব সংগঠন ফংগঠন...?"

রূপসা হাসল, "আমার নিয়তি মেসোমশাই।"

"মানে?"

"সে আর এক গল্প। তখন আমি এম এ পড়ি। কল্যাণীতে। হঠাৎই আমাদের এক ক্লাসমেটকে ইউনিভার্সিটি হস্টেল থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। খুব নিরীহ, ভীষণ ভালমানুষ, লেখাপড়া নিয়েই থাকত আমাদের বন্ধুটা। কী তার অপরাধ? বাংলাদেশ সীমান্তে গিয়ে সে কিছু বিস্ফোরক তথ্য জোগাড় করেছিল। বর্ডারে যে-চোরাচালানের ব্যবসা চলে, তার পিছনে আছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের মদত। তা এ তো অনেকেই জানে। আমাদের বন্ধু যে এক্সট্রা খবরটা এনেছিল, ওই চোরাচালানে নাকি থাকে অনেক রাজনৈতিক দাদাদের ডিরেক্ট প্রশ্রয়। কোন-কোন নেতা এই চক্রে আছে, তাদের একটা কমপ্লিট লিস্টও বানিয়েছিল রথীন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে বলেই অবশ্য জেনেছিল। তারপর গোটা ব্যাপারটা নিয়েও একটা আর্টিকল লিখেছিল স্থানীয় পত্রিকায়। ব্যস, নেতারা চটে কাঁই! ওকে পাকড়াও করিয়েই শুধু থামল না, দেশদ্রোহের চার্জ আনা হল ওর বিরুদ্ধে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে রথীনের বাড়ির লোকরা তাকে জামিনে ছাড়িয়েছিল। কিন্তু ও তখন মানসিকভাবে পুরো বিধ্বস্ত। কদিন পরেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়ে।"

"বলো কী? এমন হয় নাকি?"

"এমনই হয় মেসোমশাই! যারাই যেখানে শাসকপক্ষ, তাদের স্বার্থে ঘা পড়লেই তারা রাষ্ট্রের দাঁতনখ দেখায়। এটা আমায় ভীষণ ভীষণ হার্ট করেছিল। তখনই ডিসাইড করি, রাষ্ট্রের সন্ত্রাস রুখতে কিছু একটা করব। তবে পাল্টা হিংসার পথে নয়। অন্য কোনওভাবে।"

রাতে শোওয়ার ঘরে পায়চারি করতে-করতে ভাবছিল অনুব্রত। রূপসা মেয়েটা তাকে ভারী চিন্তায় ফেলেছে। কস্মিনকালে যে রাজনীতি, আন্দোলন-ফান্দোলন করত না, একটি মাত্র ঘটনা তার জীবনের অভিমুখ বদলে দিল, এ কি বিশ্বাস্য? এমন তো কতই ঘটে। প্রত্যেকের জীবনেই। বারীনই তো দুর্নীতির পাঁক দূর করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। খারাপ লেগেছিল অনুব্রতর, দুঃখ হয়েছিল বারীনের জন্য। তা বলে সে তো কোমর বেঁধে নামেনি পঙ্কোদ্ধারে! অথচ মেয়েটা দাবি করছে, ওই সহপাঠীর মৃত্যুই নাকি...স্বগতোক্তির মতো অনুব্রত বলে ফেলল, "যাঃ, মোটেই তা হয় না।"

করবী শোওয়ার তোড়জোড় করছে। ঘুরে তাকিয়ে বলল, "কী হয় না?"

"ওই যে, রূপসা যা সব বলছিল...ক্লাসমেটের মৃত্যুতে চৈতন্যলাভ... ভবিষ্যতে কীসব গড়বে-টড়বে..."

"করতেও পারে। মেয়েটার খুব জেদ আছে। জিল আছে।"

"নিজের কোনও ফিউচার নেই? চাকরি করবে না? সংসার চাই না?"

"হয়তো পাশে-পাশে সংগঠনও করবে। কাজটাকে সে যখন কর্তব্য বলে মনে করছে..."

"কীসের কর্তব্য? করে ওর লাভটা কী? চাকরি-সংসার হলে ওই সব আদর্শ-ফাদর্শ সেকেন্ডারি হয়ে যায়! কত ধরনের আপসের মধ্যে দিয়ে মানুষকে যে যেতে হয় তখন।"

"সব্বাই কি এক ছাঁচে গড়া, ইঞ্জিনিয়ারসাহেব? কেন ভাবছ আমাদের রাজা-ছোটুরাই একমাত্র মডেল? তার বাইরেও আছে কেউ-কেউ।"

বিশ্বাস হয় না অনুব্রতর। এতগুলো বছর বাঁধা ছকে কাটিয়ে গণ্ডির বাইরেও কিছু আছে, বিশ্বাস করার শক্তিটাই বুঝি লুপ্ত এখন। তাও কেন যে বিশ্বাস করতে প্রাণ চায়? প্রদীপ হাতে একটা মেয়ে সোজা হেঁটে চলেছে, দু'পাশের গাঢ় অন্ধকারে একটু-একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে দ্যুতি...আনমনা পায়ে অনুব্রত শয্যায় এল। মাথা রেখেছে বালিশে। মেয়েটা খুব চতুর নয় তো? আজব-আজব কাহিনি ফেঁদে নিজের একটা ভাবমূর্তি বানাল কি? বিভ্রান্ত করছে না তো অনুব্রতদের? অভিনয় করে? তাও সম্ভব, তাও সম্ভব। নাকি মেয়েটা সত্যিই একটা স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চায়? আর পাঁচজনের চেয়ে একটু আলাদা ভাবে? উঁহু, নিশ্চিত হতে পারছে না।

অচেনা এক দোলাচলে দুলছে মন। অনুব্রতর ঘুম আসছিল না।

প্রথম সেমেস্টারের রেজাল্ট বেরিয়েছে আজ। খবরটা শুনেই সম্পূর্ণা দৌড়েছিল অফিসে। মার্কশিট হাতে পেয়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। নাঃ, অকারণ আশঙ্কা করছিল, মোটেই তেমন খারাপ হয়নি। প্রায় একাত্তর পার্সেন্ট। এম এসসির প্রথম পরীক্ষা হিসেবে মোটামুটি ভালই তো। তাও তো একটা থিওরি পেপারে বেশ ধেড়িয়েছে। থার্মোডায়নামিক্সটাই জব্বর গাঁট ছিল। নার্ভাস হয়ে কী সহজ একটা অঙ্ক ভুল করে এসেছিল। ছিঃ! তারপরও বাহান্ন পেয়েছে। প্র্যাক্টিক্যালের মার্কসই তাকে বাঁচিয়ে দেয়েছে জোর।

বিনীতাও মার্কশিট নিয়ে ফিরছে। সম্পূর্ণাকে দেখে বলল, "কত হয়েছে রে তোর?"

সম্পূর্ণার জবাব শুনে তার চোখে গোল, "তুই তো হেভি ছুপা রুস্তম রে!"

সম্পূর্ণা হেসে বলল, "তুই কত পেয়েছিস?"

"সিক্সটি পারসেন্ট। টায়ে-টায়ে। আমাদের গ্রুপের মধ্যে তুই বোধ হয় হায়েস্ট।"

হ্যাঁ, বিনীতাদের দলে এখন সম্পূর্ণাও আছে বই কী। একসঙ্গে ঘোরাফেরা, ক্যান্টিন লাইব্রেরি...এর মধ্যে এক-দু'দিন বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমাও গেছে সম্পূর্ণা। খুব একটা যে ইচ্ছে ছিল তা নয়, শাহরুখ খানের ছবি বলেই যাওয়া। তেমন ভালও লাগেনি। শাহরুখের পুরনো ছবিগুলোই বরং সম্পূর্ণাকে বেশি টানে। তবে এই সিনেমা টিনেমায় গিয়ে অন্য একটা লাভ হয়েছে সম্পূর্ণার। তৃষা, বিনীতা, শ্যামলেন্দুদের দঙ্গলটার সঙ্গে গল্পে-আড্ডায়, হাসিঠাট্টায় তার জড়তা কেটেছে অনেক। এখনও অবশ্য খুব একটা বেশি কথা বলে না, তাও অন্যদের রঙ্গরস উপভোগ করার মজাটুকু তো সে পাচ্ছে।

করিডোরে ভিড় জমেছে রীতিমতো। ছোট-বড় জটলায় কাটাছেঁড়া চলছে রেজাল্টের। কারওর মুখ শুকনো, কেউ বা খুশিতে ঝলমল। অনেকেই ভাবলেশহীন। তাদের দেখে বোঝার উপায় নেই ফেল করেছে, না ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। তৃষা, শর্বরী, কৌস্তুভরাও হাজির। সমস্বরে তারিফ জানাচ্ছে সম্পূর্ণাকে।

শর্বরী হাসতে-হাসতে বলল, "তোর তো কপাল পুড়ল রে সম্পূর্ণা!"

ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে সম্পূর্ণা বলল, "কেন?"

"কী কথা হয়েছিল, অ্যাঁ? আমাদের মধ্যে যে সব চেয়ে বেশি পাবে, সে সব্বাইকে ট্রিট দেবে?"

"ইস, এরকম কথা কবে হয়েছিল?"

"হয়েছিল। তোর মাথায় নেই!" বলেই শর্বরী চোখ কুঁচকে সম্পূর্ণার ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখখানা দেখল ঝলক। পরক্ষে সজোরে চাপড়, সম্পূর্ণার কাঁধে। মিচকে হেসে বলল, "ঘেবড়িওনি খুকি। ধরো, এইমাত্রই হল কথাটা।"

তৃষা বলল, "সরি শর্বরী। কোপটা সম্পূর্ণাকে নয়, মারতে হবে শ্যামলেন্দুকে।"

"কেন? কেন?"

"ও সম্পূর্ণার চেয়ে ছ'নম্বর বেশি পেয়েছে। আমি ওর মার্কশিট দেখেছি।"

"নিউজটা তুই এখনও চেপে আছিস?" বিনীতা ছটফট করে উঠল। তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক, "গেল কোথায় শ্যামলেন্দুটা?"

"ও তো গোড়াতেই মার্কশিট নিয়ে ভেগেছে। যার সঙ্গে সুসংবাদটা শেয়ার করলে ওর ইহজীবন সার্থক হবে, সম্ভবত তারই মুখোমুখি বসে আছে।"

কৌস্তুভ চোখ টিপল, "ও। সাইকোলজির সেই লম্বু মেয়েটার সঙ্গে?"

"আমার ধারণা। কারণ, রেজাল্ট নিয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেছে কিনা!"

"শ্যামলেন্দু পারেও বটে। সাইকোলজির মেয়ের সঙ্গে কেউ ইন্টুমিন্টু করে! ব্যাটা জানে না, ওরা সাঁড়াশি দিয়ে মনের কথা টেনে বের করে। কনশাস, আনকনশাস, সাবকনশাস...মাইন্ডের একটিও লেভেল ও গোপন রাখতে পারবে না।"

"কারওকে ঝাড়ি মারলেও ক্যাচ কট-কট!" তৃষা হাসছে খিলখিল। মুখভঙ্গি করে সম্পূর্ণাকে বলল, "ডেঞ্জারটা বুঝছিস? অতীতে কোনও কেলো করে থাকলেও কনফেস করিয়ে ছাড়বে ব্যাটাকে। হি হি হি হি..."

সকলেই হাসছে। কিন্তু সম্পূর্ণার বুক যে কেন ধড়াস করে উঠল হঠাৎ? এখন তো তার আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সেই যে একদিন জোর ধাতানি দিল সম্পূর্ণা, তারপর তো আর চিনুদা যোগাযোগ করতে পারেনি। সম্পূর্ণাকেও অবশ্য যথেষ্ট সাবধান থাকতে হয়েছে। পুজোয় নিচিন্দায় গিয়ে বাইরে বেরোয়নি বিশেষ। ভাইয়া, মা, পিসি, সবাই একদিন বর্ধমানে ঠাকুর দেখতে গেল, সে রয়ে গেল বাড়িতে। ক্রিসমাসে দু'-তিনদিন গ্রামে ঘুরে আসাই যেত, সম্পূর্ণা সল্টলেক ছেড়ে নড়েইনি। অতীত তার চাপা পড়ে গেছে, এটুকু এখন ধরে নেওয়াই যায়।

কৌস্তুভ তাড়া লাগাচ্ছে, "চল, চল, ক্যান্টিনটা একবার ঢুঁ মেরে দেখি। যদি শ্যামলেন্দু মেয়েটার সঙ্গে থাকে..."

হই হই করে ছুটল সকলে। যেতে-যেতে বিনীতা সম্পূর্ণাকে বলল, "তোর কিন্তু রেহাই নেই রে। ছোটখাটো ট্রিট নয়, তোকে একটা পার্টি দিতে হবে।"

সম্পূর্ণা রগুড়ে গলায় বলল, "আমার অপরাধ?"

বিনীতা সব খবর রাখে, "তুই তো রামস্বামী ফাউন্ডেশনের স্কলারশিপটা

পেয়েছিস। যত ছোট করেই টাঙানো থাক নোটিস বোর্ডে, আমার নজর কিন্তু এড়ায়নি।"

কৌস্তুভ বলল, "ইজ় ইট? ওরা তো প্রচুর টাকা দেয়!"

"সম্পূর্ণা ভালই দাঁও মেরেছে। ষাট হাজার! শুধু এই বছরের জন্য!"

"ওয়াও! তা হলে তো ডিসকোয় যেতে হয় রে!"

"অত দরকার নেই। ধর, একদিন সবাই মিলে মাল্টিপ্লেক্সে মুভি দেখলাম, তারপর ফুডকোর্টে খাওয়া..." তৃষা বলল, "কী রে, পেয়েছিস টাকাটা?"

"হ্যাঁ। পরশু, চেকে।"

"ব্যস, তা হলে আর কি, দিনটা ফিক্স করে ফ্যাল!"

সম্পূর্ণা অস্বস্তিতে পড়ে গেল। চেক তার হস্তগত হয়েছে ঠিকই, তবে ওই অবস্থায় পড়ে আছে। টাকা এখনও বিশ বাঁও জলে। চেকটা পেয়ে বাবাকে ফোন করেছিল। রবিবার আসবে বাবা। গুসকরায় একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে সম্পূর্ণার নামে, সেখানে জমা হবে চেক। টাকা ক্যাশ হলেও পুরো ষাট হাজার তো পাবে না সম্পূর্ণা। নেওয়া উচিতও নয়। চাষবাসের যা ক্ষতি হল এবার! সম্পূর্ণা বড় জোর অর্ধেকটা নেবে। তাতেই আগামী মাসচারেক কলকাতা বাসের খরচ কুলিয়ে যাবে মনে হয়। মে মাসের শেষাশেষি সেকেন্ড সেমেস্টার, এখন চলছে ফেব্রুয়ারি, এই ক'মাস নিজের খরচ চালিয়ে নিতে পারলে বেশ খানিকটা সাশ্রয়ও হবে বাবার। অবশ্য ওই টাকাটা পেলে বন্ধুদের নিয়ে একদিন আমোদ আহ্লাদ করতেই পারে সম্পূর্ণা। কিন্তু মাল্টিপ্লেক্সে টিকিটের যা দাম! ফুডকোর্টের খাবারও কিছু সস্তা নয়। একটা পিৎজাই তো দেড়শো-দু'শো...সব মিলিয়ে দু'-আড়াই হাজারে কুলিয়ে যাবে তো?

বন্ধুরা খাওয়ানোর কথা বললেই কেন যে এত হিসেব এসে জট পাকায় মগজে! সম্পূর্ণার যেন একটু হীনম্মন্যতাও জাগে। সে যে বন্ধুদের চেয়ে কমজোরি, ইচ্ছেমতো খরচ করার তার ক্ষমতা নেই, এটাই তাকে কুরে-কুরে খায়। কী করবে সম্পূর্ণা, মনের উপর তো হাত নেই!

সম্পূর্ণা আলগাভাবে বলল, "এক-দু'সপ্তাহ যাক রে। এখন একটু অসুবিধে আছে।"

"কী অসুবিধে?"

"না মানে..."

বিনীতা বুঝি কিছু আন্দাজ করেছে। তৃষাকে ধমক দিল, "অ্যাই, ওকে একদম প্রেশার দিবি না। যখন ওর সময়-সুযোগ হবে, তখনই না হয় আমরা এনজয় করব।"

বাঁচাল বটে বিনীতা! পাশাপাশি একটা কুটুস কামড়ও টের পেল সম্পূর্ণা। হীনম্মন্যতা আরও বেড়ে যাচ্ছে যেন। ক্যান্টিনে পৌঁছতেই ভারটা অবশ্য নেমে গেছে। কী সৌভাগ্য, শ্যামলেন্দু মজুত। সেই হবু মনোবিদসমেত। আজ ক্যান্টিন আশ্চর্য রকম ফাঁকা! এদিক-ওদিক থেকে ঝটাঝট চেয়ার টেনে শ্যামলেন্দুকে প্রায় ঘিরে ফেলল সকলে। তাকে প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়েই মোগলাই পরোটার অর্ডার হয়ে গেল। প্রশংসার নাম করে টকাটক চাঁটি পড়ছে শ্যামলেন্দুর মাথায়। মুখ টিপে হেসে দীর্ঘাঙ্গী ধাঁ! অমনই সকলে আরও চাপছে শ্যামলেন্দুকে।

কৌস্তুভ বলল, "তোর কোয়েশ্চেনেয়ারটা দে তো।"

"কীসের কোয়েশ্চেনেয়ার?"

"আরে, সাইকোলজির পাবলিকগুলো যা পকেটে নিয়ে ঘোরে! নিশ্চয়ই তোকে প্রেমসংক্রান্ত শ'খানেক প্রশ্ন দিয়েছে।"

"আওয়াজ মারিস না তো। আমি মোটেই গার্গীর সঙ্গে ইয়ে করছি না।"

"ও, তুই বুঝি ওর স্টাডি কেস?"

"নাকি তুই ওর কেমিক্যাল, থুড়ি ফিজিক্যাল বন্ডিংটা টেস্ট করছিস? চোখই বুঝি তোর স্পেকট্রোমিটার?"

খেপে গিয়ে শ্যামলেন্দু কিছু একটা বলল। পাল্টা খোঁচা দিল তৃষা, ফোড়ন কাটছে শর্বরী...শ্যামলেন্দু হাঁউমাঁউ করে উঠল কিংবা হাসছে হোহো... এমন হুল্লোড়ে সম্পূর্ণাও অংশ নিচ্ছে মাঝে-মাঝে। কুটুসকাটুস চুটকি কাটছে হঠাৎ হঠাৎ। এসব সময়ে জীবনটাকে ভারি মধুর লাগে সম্পূর্ণার। ক্লেদ গ্লানি, ভাবনাচিন্তা, হিসেবপত্র, সব যে কোথায় উবে যায়!

চমৎকার কাটল বটে দিনটা। হইহই করে ক্লাস, প্র্যাক্টিক্যাল, অভ্যেসমতো একটুক্ষণ লাইব্রেরির বুড়ি ছুঁয়ে আসা। বেরতে-বেরতে সেই সন্ধে। বাসস্টপে বেশ কিছু যাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীও আছে কয়েকজন। সম্পূর্ণা গিয়ে দাঁড়াল সেখানে। দাঁড়িয়েই আছে, দাঁড়িয়েই আছে, বাসের দেখা নেই। এক অধৈর্য যাত্রী হনহনিয়ে রাজাবাজারের মোড়টায় গেল। ঘুরে এসে উচ্চৈঃস্বরে তার সঙ্গীকে বলছে, "এ তো খুব বিপদ হল রে। শেয়ালদা ফ্লাইওভারে একটা ট্রাম বেলাইন হয়েছে, গোটা ব্রিজ জ্যাম। কোনও গাড়ি পাস করছে না।" সঙ্গীটি কী যে বলল, অমনই দু'জনে হাঁটা শুরু করল মানিকতলার দিকে। অপেক্ষমান ভিড় পাতলা ক্রমশ। রূপসা দেখল সময়, ছ'টা কুড়ি। আর কাঁহাতক তীর্থের কাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে! সেও এবার পায়ে-পায়ে এগোলেই তো পারে। শেষ মাঘের সন্ধে। শিরশিরে বাতাসে বিদায় শীতের গন্ধ। দেরি হয়ে গেছে বলে একটু জোরেই পা চালাচ্ছিল সম্পূর্ণা। রোলের দোকানটা সবে পেরিয়েছে, পিছন থেকে আচমকা ডাক, "পুন্যি, দাঁড়া!" শিরদাঁড়া বেয়ে হিমস্রোত বয়ে গেল সম্পূর্ণার। পলকে স্থানুবৎ। মনের ভুল নয় তো? সম্পূর্ণা কোনও ক্রমে ঘাড় ঘোরাল। হায় ভগবান, চিনুদাই তো! পরনে জিন্‌স আর জ্যাকেট। দাঁত বার করে হাসছে।

এক পা-এক পা করে সম্পূর্ণার একদম সামনে এসে থামল চিনু। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে খপ করে চেপে ধরল সম্পূর্ণার হাত, "তোর ব্যাপারখানা কী, অ্যাঁ? মোবাইলের সিম চেঞ্জ করলেই তুই বুঝি আমায় ভাগিয়ে দিতে পারবি?"

সম্পূর্ণা জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিল। চাপা স্বরে বলল, "হচ্ছেটা কী?"

"তুই আমায় বড্ড কষ্ট দিয়েছিস রে পুন্যি। কত কাল তোকে দেখিনি বল তো?" গাট্টাগোট্টা চেহারার চিনুর গলায় চোয়াড়ে আবেগ, "জানিস, এর আগেও আমি তিন-তিনবার বর্ধমান থেকে ছুটে এসেছি? তোর ফুটপাথেই ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছি রাত আটটা অবধি। ওই যে কখন কোথা দিয়ে পালিয়ে গেলি..."

"পালাব কেন? আমি চোর? না ডাকাত?"

"তার চেয়েও বেশি। তুই একটা খুনে!" ফের সম্পূর্ণার কবজি চেপে ধরেছে চিনু। মিনতির সুরে বলল, "একবার আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, হৃৎপিণ্ডটা কেমন ধড়াস-ধড়াস লাফাচ্ছে!"

ঝটকা মেরে সম্পূর্ণা হাতখানা সরাল। কোত্থেকে একটা সাহস এসে ভর করেছে সহসা। গলা না চড়িয়েই তীব্র স্বরে বলল, "ন্যাকামো কোরো না। হৃদয় নামক বস্তুটি তোমার থাকলে তুমি আর এখানে আসতে না।"

"থাকতে পারলাম না রে পুন্যি। মনটা এমন আনচান করে..."

"আগেই বলেছি, ওসব ফালতু কথা শোনার আগ্রহ আমার নেই।"

"কেন এমন নিষ্ঠুর হচ্ছিস রে পুন্যি? তুইও তো আমায় ভালবেসেছিলি।"

চিনুর স্বর মোটেই নিচু পর্দায় নেই। 'ভালবাসা' শব্দটারও একটা চৌম্বক টান আছে, কানে যেতেই পথচলতি লোক ঘুরে-ঘুরে তাকাচ্ছে।

সম্পূর্ণা হিসহিস করে বলল, "কত বার বলব, সেসব চুকে-বুকে গেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিন ক্রিয়েট কোরো না।"

"আমিও তো পথেঘাটে দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আয় না, আমরা কোথাও একটা দেখা করি," চিনুর গলা একটু যেন খাদে নেমেছে, "আমি এখন বেহালায় আছি। ছোটমাসির বাড়িতে। তুই যদি বলিস, কাল দেখা করবি...বল কোথায় আসবি?"

"কোথাও আসব না। ভুলেও আর আমার পিছু নেবে না, বুঝেছ?"

"কেন তুই এমন করছিস পুন্যি? আমি তে তোর মামার ছেলে, এটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলে ধরে নে না। তুই একবার শুধু মুখের কথা খসা, মা-বাবা, কারও পরোয়া করব না, সব্বাইকে ছেড়ে দেব। শুধু তুই আমি...আমি আর তুই..."

এ তো মহা ফ্যাসাদ! চিনু নামের এই মামাতো দাদাটির উপর সম্পূর্ণারও দুর্বলতা জেগেছিল ঠিকই। শরীরী মোহে কিছু ভুল হয়তো সে করেছে। কিন্তু তার জের জীবনভর বয়ে বেড়াতে হবে, এ কেমন ধারার বায়নাক্কা? মা-বাবাকে চরম দুঃখ দিয়ে, দুনিয়াসুদ্ধু লোকের নিন্দে কুড়িয়ে...এটা কি একটা সুস্থ জীবন? সবচেয়ে বড় কথা, চিনুদাকে তো সে এখন কণামাত্র পছন্দ করে না। উল্টে তার সঙ্গে কোনও এককালে সম্পর্ক হয়েছিল ভাবলেই তো গা ঘিনঘিন করে সম্পূর্ণার! কিন্তু এই নেই আঁকড়াকে সে কী করে কাটায়? চিনুকে আর ভয় পাচ্ছে না সে, কিন্তু একটা বিশ্রী বিরক্তি দানা বাঁধছে মাথায়।

কঠোর গলায় সম্পূর্ণা বলল, অনেক হয়েছে, "ছেলেমানুষিটা এবার বন্ধ করো। নইলে আমি চেঁচাব। বুঝতেই পারছ, তোমার কী হতে পারে তা হলে।"

"বটে?" মুহূর্তে বদলে গেল চিনু, "তুই আমায় ভয় দেখাচ্ছিস?"

"ধরে নাও, তাই। নইলে তো তুমি সিধে হবে না।"

"খুব বাড় বেড়েছে তোর, অ্যাঁ? কলকতায় এসে সাপের পাঁচ পা দেখেছিস?" ঝটাকসে জ্যাকেটের পকেট থেকে মোবাইল বের করল চিনু। টক টক টিপছে বোতাম। তারপর স্ক্রিনটা মেলে ধরল সম্পূর্ণার চোখের সামনে, "দ্যাখ তো, ছবিটা চিনতে পারিস কিনা?"

সম্পূর্ণা যেন সপাং চাবুক খেল একটা! বিস্ফারিত চোখে দেখল, এ তো সেই নগ্ন সম্পূর্ণা!

চিনু চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "আর একটা দ্যাখ। আরও একটা..."

পরপর ফুটছে ছবি। কী কদর্য! কী ভয়ঙ্কর! এসব নোংরা-নোংরা ছবিগুলো তুলতে দিয়েছিল সম্পূর্ণা?

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সম্পূর্ণার মুখ। হাঁটু কাঁপছে। কাতর গলায় বলল, "ওগুলো মুছে দাও চিনুদা, তোমার পায়ে পড়ি, প্লিজ।"

"দাঁড়া, দাঁড়া। এগুলো তোর চেনাজানা লোকদের এসএমএস করে পাঠালে কেমন হয় বল তো? তারা নিশ্চয়ই উপভোগ করবে? ধর তোর বাবাই যদি দেখে...পিসেমশাই তো মোবাইল নাম্বার বদলায়নি। তারপর ধর, এগুলোকে প্রিন্ট করে তোর সায়েন্স কলেজের গেটেও তো ঝুলিয়ে দেওয়া যায়..."

"ছি, ছি। চিনুদা প্লিজ..."

কী বলবে সম্পূর্ণা ভেবে পাচ্ছিল না। নিজেই চেপে ধরেছে চিনুর হাত। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "কেন তুমি আমার এমন ক্ষতি করবে? তুমি না একসময় আমায় ভালবাসতে?"

"এখনও বাসি। তুইও এবার পথে আয়। তোর নতুন মোবাইল নাম্বারটা বল," সম্পূর্ণা ইতস্তত করছে দেখে চিনু দাবড়ে উঠল, "কী হল, বল?"

যন্ত্রের মতো সংখ্যাগুলো আউড়ে গেল সম্পূর্ণা।

টপাটপ চিনু তুলে নিলে মোবাইলের স্মৃতিভাণ্ডারে। একবার রিং করেও দেখল, বাজে কিনা।

সম্পূর্ণা করুণ মুখে বলল, "এবার তা হলে খুশি? কোরো ফোন।"

"শুধু ওইটুকুতে তো হবে না রে পুন্যি। কত কষ্ট করে এত সুন্দর-সুন্দর ছবি তুলেছিলাম, এতদিন সেগুলো যত্ন করে জমিয়ে রেখেছি, তার কোনও দাম নেই?"

মস্তিষ্ক কেমন বিবশ হয়ে যাচ্ছিল সম্পূর্ণার। অস্ফুটে বলল, "মানে?"

"তোকে যে মাঝে-মাঝে আমার কাছে আসতে হবে। রাস্তাঘাটে নয়, কোনও হোটেলের ঘর-টরে। আমিই ভাড়া করব, দিনক্ষণও তোকে জানিয়ে দেব, তুই শুধু এসে আমার সঙ্গে দু'-চার ঘণ্টা কাটিয়ে যাবি।"

সম্পূর্ণা প্রায় ফোঁপাচ্ছে, "এ হয় না। আমি পারব না।"

"খুব পারবি...এখন কেঁদেকেটে রাস্তায় সিন ক্রিয়েট করিস না!" সম্পূর্ণার ক্ষণপূর্বের কথাই যেন ফেরত দিল চিনু। কর্কশ স্বরে বলল, "আমি তোকে ফোন করব। ফের নাম্বার বদলাস না কিন্তু।"

"চিনুদা, প্লিজ..."

জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করল না চিনু। দৌড়ে পেরোল রাস্তা। চলে গেল উল্টো ফুটপাথে।

সম্পূর্ণা নিশ্চল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়! দুলছে পৃথিবী, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে পথঘাট।

কোলাপসিবল গেটটা ঠেলে সরাল সম্পূর্ণা। টেনে-টেনে তুলছে পা দুটো। দোতলায় উঠে হাঁপাচ্ছে।

বসার ঘর থেকে তির বেগে বেরিয়ে এল করবী। উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, "কী হল, আজ এত দেরি?"

সম্পূর্ণার গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরল, "হয়ে গেল।"

"তোমার বাবা তো ফোন করেছিলেন, উনি নাকি রবিবার আসছেন?"

সম্পূর্ণা কি ঘাড় নাড়ল? হয়তো।

করবী হেসে বলল, "তুমি যে একটা স্কলারশিপ পেয়েছ, বলোনি তো?"

সম্পূর্ণার ঠোঁট কি ফাঁক হল সামান্য? কে জানে।

করবী বলল, "খুব ভাল খবর। আমি ভীষণ ভীষণ খুশি হয়েছি...বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছে আজ?"

সম্পূর্ণার মাথা কি দুলল সামান্য? বোঝা মুশকিল।

করবী আলতো হাত রাখল সম্পূর্ণার কাঁধে, "যাও, গিয়ে রেস্ট নাও। এখন আর চা দিচ্ছি না, একেবারে ভাত খেতে বসে যেও।"

নতমস্তকে মন্থর পায়ে এগোচ্ছে সম্পূর্ণা। কতটুকুই বা পথ, তবু যেন ফুরোয় না। দরজা অবধি পৌঁছতে কত যুগ যে লাগল। পাল্লা ঠেলে ঢুকেছে ভিতরে। নিজের বিছানায় গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল।

রূপসা আগেই ফিরেছে। কাজ করছে চেয়ারে বসে। টেবিলে ল্যাপটপ খোলা, বেশ কয়েকখানা বইও। মাঝে-মাঝে ঝুঁকছে বইয়ের পাতায়, পড়ছে কী যেন, তার পরেই ল্যাপটপের কি-বোর্ডে সচল হচ্ছে তার আঙুল।

সম্পূর্ণার উপস্থিতি টের পেয়েছে রূপসা। ঘুরে একবার সম্পূর্ণাকে দেখে নিয়ে কাজ করতে করতেই বলল, "তোর আজ সেমেস্টারের রেজাল্ট বেরনোর কথা ছিল না?"

সম্পূর্ণা ডুবে যাওয়া স্বরে বলল, "হুঁ।"

"ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস নিশ্চয়ই?"

"হুঁ।"

"অত নেতিয়ে-নেতিয়ে বলছিস কেন? মনমতো হয়নি বুঝি?"

সম্পূর্ণা জোর করে খানিকটা সপ্রতিভ ভাব আনল গলায়, "না, রূপসাদি। ভালই হয়েছে।"

"ভালই হয়েছে!" ঠাট্টার ঢঙে ভেংচে উঠল রূপসা। চেয়ার ঘুরিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলল, "হাতে করে এক পিস সন্দেশও তো আনতে পারতিস।"

সম্পূর্ণা কি মুখ ফুটে বলতে পারে, এই মুহূর্তে তার মনে তিলমাত্র আনন্দ নেই? বরং একটা শঙ্কা তাকে ছেয়ে ফেলেছে? আতঙ্কে জিভ-টাগরা গলা শুকিয়ে কাঠ? তবু জল পর্যন্ত খেতে পারছে না, মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে! মানিকতলা থেকে কীভাবে বাস-অটো ধরে সল্টলেকে এল, কীরকম ভিড় ছিল বাসে, টিকিট কেটেছিল কিনা, অটোয় তার সহযাত্রীরা পুরুষ না মহিলা — কিচ্ছুটি যেন তার স্মরণে নেই। শুধু চিনুদার নির্দয় চোখ দু'খানাই যেন এখনও দেখতে পাচ্ছে। তাকে যেন গিলে খেতে আসছে।

সম্পূর্ণা কোনওমতে বলল, "সরি রূপসাদি। ভুল হয়ে গেছে।"

"যাক, আর 'সরি' হয়ে কাজ নেই!" রূপসা শব্দ করে হাসল, "আমি বড়, আমারই তো তোকে মিষ্টিমুখ করানো উচিত।" বলেই খাটে ফেলে রাখা নিজের ব্যাগটা টেনে ঘাঁটছে। রাশি-রাশি জিনিসে ঠাসা ঢাউস ভ্যানিটি ব্যাগ, তাতে কী আছে আর কী নেই। বিস্তর হাতড়ে অবশেষে মিলেছে প্রার্থিত দ্রব্যটি। হাসিটাকে চওড়া করে বলল, "খুকখুক কাশি হচ্ছিল ক'দিন। একগাদা কাফ লজেন্স কিনেছিলাম। নে, খা একটা। মনে কর, এটাই লবঙ্গলতিকা!"

সিন্থেটিক কাগজের মোড়ক ছেঁড়ার চেষ্টা করল সম্পূর্ণা। জোর পাচ্ছে না আঙুলে।

রূপসাই খুলে দিয়ে বলল, "তোর বাড়িতে খবরটা দিয়েছিস?"

"না, রাতে বলব।"

"তোর কী হয়েছে বল তো? কুঁতিয়ে-কুঁতিয়ে জবাব দিচ্ছিস কেন?" রূপসার দৃষ্টি এবার সার্চলাইট, "তোর এরকম অন্যমনস্ক লাগছে কেন রে?"

"কই, না তো!"

"বললেই মানব? ভাল রেজাল্ট করেছিস, কোথায় খুশিতে নাচবি তা নয়, মুখখানা একেবারে কালি মেরে আছে," রূপসার নজর আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে, "ইউনিভার্সিটিতে কিছু হয়েছে নাকি? এনি সর্ট অফ প্রবলেম? হ্যারাসমেন্ট?"

"না, না।"

"তা হলে রাস্তায় কিছু? সল্টলেকে একটা বাইকবাহিনী ঘুরছে আজকাল। একলা মেয়ে দেখলেই অসভ্যতা করছে গ্রুপটা। ওদের সামনে পড়ে গিয়েছিলি নাকি?"

সম্পূর্ণা যে আস্ত একটা যমদূতের সামনে পড়েছিল, একথা কীভাবে উচ্চারণ করবে? অথচ বলতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল। রূপসাদিকে কি জানানো যায়? রূপসাদির খুব সাহস। চিনুদার মতো শয়তানকে সামনে পেলে হয়তো তার ধুন্ধুড়ি নেড়ে দিতে পারে! কিন্তু এ ক্ষেত্রে করবেটা কী? শুনেই দারুণ খেপে যাবে নিশ্চয়ই। হয়তো সম্পূর্ণাকে টেনে নিয়ে যাবে থানায়। কমপ্লেন লেখাবে চিনুদার বিরুদ্ধে। কিন্তু তারপর? সর্বত্র জানাজানি হয়ে যাবে না ঘটনাটা? মামাতো দাদার সঙ্গে সম্পর্ক, অশালীন ছবি, সব প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর সম্পূর্ণা কোথায় মুখ লুকোবে? এবাড়ির আশ্রয় যাবেই, লেখাপড়ার পাটও খতম...আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও রাস্তা কি থাকবে তখন? প্রাণপণ চেষ্টায় ঠোঁটে একটা হাসির মতো ভঙ্গি ফোটাল সম্পূর্ণা। কৃত্রিম উজ্জ্বল স্বরে বলল, "না গো রূপসাদি, কিচ্ছু হয়নি। বিকেল থেকে গা'টা বড় গুলোচ্ছে, এই যা। মাথাটাও টিপটিপ করছে।"

"দেখিস, ভাইরাল না ধরে! সিজন চেঞ্জের টাইম, চারদিকে খুব জ্বরজারি হচ্ছে!" রূপসা ফের টেবিলে।

সম্পূর্ণা কি স্বস্তি বোধ করল? আরও গভীর বিপন্নতা আসছে জেনেও?

টিউটোরিয়াল ক্লাসটা নিয়ে রূপসা ডিপার্টমেন্টে ফিরল। চক-ডাস্টার রেখে দৌড়েছে প্রতিম গুপ্তর ঘরে। গবেষণার কাজ বেশ খানিকটা এগিয়েছে, একটা খসড়া মতো বানিয়ে তুলে এনেছে পেনড্রাইভে। স্যারকে এবার একটু দেখিয়ে নেওয়া দরকার। প্রতিম গুপ্ত কম্পিউটারে খুব একটা সড়গড় নয়। তার নিজের ঘরে ডেস্কটপ আছে, অনন্যোপায় না হলে খোলে না সেটি। তাই নিজের ল্যাপটপটাই রূপসাকে বয়ে আনতে হল।

নেমপ্লেট সাঁটা ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে রূপসা হতাশ। যা ভয় পেয়েছিল তাই, স্যার নেই। অথচ আজ সকালেও বললেন, দুটোর পর থেকে রুমেই থাকবেন! এখন রূপসা কোথায় খুঁজবে স্যারকে? হয়তো প্রশাসনিক ভবনে

গিয়ে বসে আছেন। রূপসা একটা কল করবে? উপাচার্যর সঙ্গে প্রতিম গুপ্তর খুব দহরম মহরম, হয়তো তাঁর চেম্বারেই...ওখানে ফোন গেলে বিরক্ত হতে পারেন স্যার। অগত্যা প্রতীক্ষাই করো। বাইরের করিডোরে এসে দাঁড়াল রূপসা। অজস্র ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। বিচিত্র এক গুঞ্জন উঠছে। বহরমপুরে তাদের কলেজের কার্নিসে প্রকাণ্ড এক চাক বানিয়েছিল মৌমাছিরা, কাছে গেলেই ভনভন একটা আওয়াজ শোনা যেত, এও যেন তেমন। শুধু একটু উচ্চকিত, এই যা! নির্দিষ্ট অবয়বহীন এই ছাত্রছাত্রীদের মেলা দেখতে রূপসার বেশ লাগে। দিব্যি সময় কেটে যায়।

কিন্তু ফের তলপেটে ব্যথা করছে যে। সেই নিত্যনৈমিত্তিক মাসিক বখেড়া। পরশু শুরু হতে পারত। শনি-রবি শুয়ে বসে থেকে পার হয়ে যেত ঝামেলার সময়টা। ভালই ব্লিডিং হচ্ছে, একবার ন্যাপকিনটা বদলাতে পারলে হয়। ঘুরে আসবে টয়লেট থেকে?

সুযোগ মিলল না। হাজির হয়েছে প্রতিম গুপ্ত। ষাটের পর বয়স, গোলপানা মুখ, একমাথা টাক। কালো মোটা ফ্রেমের চশমায় অধ্যাপকসুলভ গাম্ভীর্য।

রূপসাকে দেখে প্রতিম ডাকল, "এসো, এসো, কাজে বসা যাক। আমাকে আবার তিনটের সময় বেরতে হবে।"

"মিটিং আছে নাকি স্যার?"

"ওই রকমই। আন্ডার গ্র্যাজুয়েশনের সিলেবাস নিয়ে ক'জন বসব।"

রূপসা মনে-মনে হাসল একটু। বিদগ্ধ অধ্যাপকদের খানিক গুলতানি হবে আর কি। তবে কথাটি না বলে বসে পড়ল স্যারের চেম্বারে। ল্যাপটপ অন করে গুঁজল পেনড্রাইভ। তারপর মনিটর প্রতিমের দিকে ঘুরিয়ে স্যারের চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিম ঝুঁকল সামান্য। পর্দায় চোখ বুলিয়ে বলল, "ইন্ট্রোডাকশন তো আমি দেখেছি। তারপর কী করেছ, বের কর।"

"সূচনাটাও অনেক বদলেছি স্যার। সিপাই বিদ্রোহের কারণগুলো নিয়ে যেসব পরস্পরবিরোধী মতামত আছে, সেগুলোকে আরও বিশদ করেছি। যেমন, উত্তরপ্রদেশের ঠাকুররা কেন সিপাইদের সমর্থন করেছিল, কিংবা অন্য সমস্ত ল্যান্ডেড ক্লাস কেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন মানতে চাইছিল না...তারপর ধরুন, হিন্দুদের সামাজিক কুপ্রথাগুলো দূর করতে গিয়ে কোম্পানি হিন্দুদেরই একটা মেজর সেকশনের বিরাগভাজন হয়েছিল..."

"ওগুলো পরে দেখব। ফাইনাল রাইটিংয়ের সময়ে। তুমি নেক্সট চ্যাপ্টারগুলোয় চলো।"

পরের অধ্যায়টা খুলল রূপসা। দেখছে প্রতিম।

রূপসা বলল, "আমি মূলত তিনটে ভারতীয় সংবাদপত্র ধরছি স্যার। হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া আর বেঙ্গল হরকরা। একটা গুজরাতি কাগজেরও ইনপুট নিয়েছি। মরাঠি কাগজও আছে দেখলাম।"

প্রতিম অধ্যায়ে চোখ রেখেই বলল, "খবরের কাগজগুলোর ভিউ অ্যানালিসিস করেছ?"

"শুরু করেছি স্যার। তবে এখনও খুব একটা প্রসিড করতে পারিনি। ওই কাগজগুলোর দৃষ্টিকোণ এতটাই একপেশে...সবাই তো সিপাইদের বিরুদ্ধে। বরং ব্রিটিশ কাগজগুলোর মধ্যে সামান্য হলেও একটা র‍্যাশনাল দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ইলাসট্রেটেড লন্ডন টাইমস, কিংবা টাইমস, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরও সমালোচনা করেছে। আমার তো মনে হয়, ওই কাগজগুলোর জন্যই ইংল্যান্ডে একটা জনমত তৈরি হয়েছিল, যার কারণে রানি ভিক্টোরিয়ার পাওয়ার টেকওভার..."সিপাই বিদ্রোহের আগেও কয়েকটা ছোট-ছোট মিউটিনি হয়েছিল স্যার। সেগুলোরও উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া নানাসাহেব, আজিমউল্লা, তাঁতিয়ে টোপে...তাঁদের সম্পর্কেও সংবাদপত্রগুলোর অ্যাসেসমেন্ট অ্যানালাইজ করছি সাধ্যমতো।"

"হুঁ, তাই তো দেখছি। তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভিউগুলোও তো দিয়েছ। গুড। প্রয়োজন বুঝলে কিছু কন্ট্রোভার্শিয়াল রিমার্কও ঢুকিয়ে দাও। অবশ্যই তথ্যপঞ্জিসহ," মনিটর থেকে দৃষ্টি সরাল প্রতিম। চোখ তুলে রূপসাকে বলল, "তোমার জুনিয়র ফেলোশিপের মেয়াদ তো এবার ফুরিয়ে এল, তাই না?"

"হ্যাঁ স্যার, এই ডিসেম্বরেই..."

"এর মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার কাজ শেষ হবে না?"

"সম্ভাবনা কম। আরও এক-দেড় বছর তো লাগবেই।"

"সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের দরখাস্তটা তা হলে করে দিও। আমার যা কমেন্টস দেওয়ার, দিয়ে দেব।"

আবার মনিটরে চোখ নামিয়েছে প্রতিম। দেখা-পড়া-আলোচনা চলছে একসঙ্গে। রূপসাকে বেশ কয়েকটা বাড়তি রেফারেন্স দিল প্রতিম, ন্যাশনাল লাইব্রেরি ছাড়া অন্যত্র সেগুলো মিলবে না। অপ্রাসঙ্গিক বিষয় কিছু ছাঁটতেও বলল। কথা ফাঁকেই রূপসা জিজ্ঞেস করল, এখনও অবধি যা কাজ হয়েছে, তা দিয়ে একটা পেপার পাবলিশ করা যায় কিনা। প্রতিমের আপত্তি নেই। রূপসাকে বলেও দিল, কোন-কোন জার্নালে পাঠাতে পারে। দুটো বিদেশি পত্রিকার কথাও বলল প্রতিম। শুনে রূপসা বেজায় উৎসাহিত।

হঠাৎ প্রতিমের খেয়াল হয়েছে। ঘড়ি দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠল, "এই রে, তিনটে দশ!"

আর একটু আলোচনার ইচ্ছে ছিল রূপসার, তবে স্যারকে তো আর আটকানো যাবে না। রূপসা বলল, "নেক্সট তা হলে কবে...?"

"দেখে দিলাম তো। আর একটু এগোও না। নতুন রেফারেন্সগুলো স্টাডি কর।"

"ও-কে স্যার।"

পেনড্রাইভ-ল্যাপটপ গুছিয়ে বেরিয়ে এল রূপসা। টয়লেট ঘুরে পায়ে পায়ে যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি গেটের দিকে। একবার ভাবল, বিতানকে ফোন করবে কিনা। পুজোর পর থেকে অনেকটা সভ্য-ভব্য হয়েছে ছেলেটা। ফাজলামি এখনও করে, তবে আর মাত্রা ছাড়ায় না। হয়তো সেই কারণেই তার সঙ্গটা রূপসা আজকাল বেশ পছন্দই করছে। চার-পাঁচ দিন টানা দেখা না হলে বিকেল-সন্ধেটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। ছেলেটা যদি নেশা-টেশাগুলো একটু কমাত!

মোবাইল বের করে রূপসা থমকাল। ওঃ হো, বিতানের তো আজ প্রোগ্রাম! নলবন, না কোথায় যেন। এবার শীতে বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠান করছে বিতানদের 'দলছুট'। নামও হচ্ছে ক্রমে-ক্রমে। রেট নাকি লাখের অঙ্ক ছুঁইছুঁই। ওই গান শুনতে কী করে যে টাকা দেয় মানুষ! বরং ওই গান সহ্য করছে বলে বিতানদেরই তো পকেটের টাকা খসানো উচিত। অবশ্য নবদিশা সম্পর্কেও বিতানের ধারণা খুব উঁচু নয়। রূপসার মতো মেয়েদের নীরস করে তুলছে বলে নবদিশাকে নাকি নিষিদ্ধ করা উচিত। রূপসা নিজের মনে হাসল। উফ, তাদের দু'জনের কী লড়াইটাই না হয়। টিভি চ্যানেলে যদি একবার মুখোমুখি বসে তারা, দর্শক হেসে কুটিপাটি খাবে!

ভাবনার মাঝে হঠাৎই হাতে মৃদু কাঁপন। মোবাইল বাজছে।

মনিটারে নামটা দেখেই রূপসা তাড়াতাড়ি ফোন কানে চাপল, "হ্যাঁ অনিমেষদা, বলুন।"

"তুমি কি ইউনিভার্সিটিতে? না বেরিয়ে গেছ?"

"না। আছি এখনও।"

"ব্যস্ত?"

"তেমন একটা নয়।"

"তা হলে একবার আমার রুমে আসবে? জরুরি কিছু কথা ছিল।"

"যাচ্ছি।"

অনিমেষের ঘরে গিয়ে রূপসা অবাক। পল্লব আর তনুকা বসে। এবং ফাল্গুনের বাতাসে চোরা গুমোট।

চেয়ার টেনে বসতে-বসতে রূপসা পরিস্থিতিটা আঁচ করার চেষ্টা করল। ইদানীং নবদিশার প্রায় প্রতিটি মিটিংয়ে তুফান উঠছে জোর। একদল জোর গলায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, রাষ্ট্রীয় হিংসা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি নেহাতই এক দুর্বল পন্থা। প্রথমত, এতে নাকি সময় লাগে অনন্তকাল। দ্বিতীয়ত, এ কাজে সক্রিয় কর্মী পাওয়া মুশকিল। তৃতীয়ত, জনগণ অনেক সময়ে হাওয়ামোরগের মতো আচরণ করে, বিপদ বুঝলে অবলীলায় রাষ্ট্রের অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণের রাস্তা খোঁজে। পল্লব, তনুকা, ইন্দ্রনীলরা তাই চায়, একটা সবল প্রতিরোধও গড়ে উঠুক। রাষ্ট্র যদি বোঝে, হিংসার আশ্রয় নিলে তারও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা, তাহলে রাষ্ট্র পিছু হটতে বাধ্য। বুনো ষাঁড়ের মুখোমুখি হয়ে তাকে নাকি শিং ধরেই থামাতে হয়। সেখানে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে কোনও লাভ নেই। মতামতটায় এখনও সায় নেই নবদিশায়, কিন্তু পল্লব-তনুকাদের প্রয়াসটা চলছে।

আজ কি অনিমেষদাকে আলাদা করে বোঝাতে এসেছে পল্লবরা? রূপসাকেও দলে টানতে চায়?

অল্প হেসে পল্লব-তনুকাকে হাত নাড়ল রূপসা। অনিমেষকে বলল, "হঠাৎ তলব?"

অনিমেষ খানিক অসহায় ভাবে বলল, "এই দ্যাখো না... পল্লবরা আমায় এমন একটা অকওয়ার্ড সিচুয়েশনে ফেলে দিচ্ছে..."

বছর তিরিশেকের কালো, রোগা তনুকা সঙ্গে-সঙ্গে আপত্তি জুড়েছে, "ও কথা বলছেন কেন? আমরা শুধু তিনটে নাম দিয়েছি, বলেছি এরা নবদিশার আগামী বৈঠকে থাকবে।"

অনিমেষ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "কিন্তু তাদের তো অ্যালাও করা যাবে না। কারণ, তারা একটি বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী গোষ্ঠীর সদস্য। ওরা ক্লাস স্ট্রাগলে বিশ্বাস করে, সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়তে চায়। নবদিশা

তো সমাজ বদলের এই পদ্ধতি মানে না।"

পল্লবের কাঁচাপাকা দাড়িময় মুখে বাঁকা হাসি ফুটল, "নবদিশা কী মানে, কী মানে না, সেটা তো নবদিশার সদস্যরাই ঠিক করবে। আপনি যে একা একাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন, এটাও তো নবদিশার পলিসি নয়।"

তনুকা অমনি পোঁ ধরেছে, "আপনার এই অ্যাটিটিউডটার মধ্যে কিন্তু একনায়ক-একনায়ক ভাব আছে অনিমেষদা।"

পল্লব বলল, "বি ডেমোক্রেটিক। নেক্সট মিটিংয়ে ভোট নিন। মেজরিটি যদি চায়, ওরা আসবে।"

তলে-তলে অনেক দূর এগিয়েছে তো! নিশ্চয়ই অনেকের সঙ্গে কথা বলে প্রস্তুত হয়েই এসেছে দু'জনে। রূপসা আর চুপ থাকতে পারল না। গলায় খানিক শ্লেষ মিশিয়ে বলল, "ভোট ব্যাপারটাতে যে আপনার আস্থা আছে, এ তো জানতাম না। সর্বদাই তো বলেন, নির্বাচন, গণতন্ত্র, ভোটাভুটি নিশ্চয়ই একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সিস্টেমকে বাঁচিয়ে রাখার হাতিয়ার? ভোটাভুটিই নাকি শেষ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে বৈধতা দেয়!"

"রাষ্ট্র আর নবদিশা এক নয় রূপসা। দুটোকে গুলিয়ে ফেলো না।"

"অর্থাৎ ভোট ব্যাপারটা আপনার চোখে কখনও ন্যায্য, কখনও অন্যায্য, তাই তো? নিজের প্রয়োজনের নিরিখে এটাকে মেনে নেওয়া যায়?" রূপসা হাসল সামান্য। পরক্ষণেই গম্ভীর মুখে বলল, "আর একটা কথাও বলতে বাধ্য হচ্ছি। অনিমেষদাই নবদিশার প্রতিষ্ঠাতা। নবদিশার উদ্দেশ্যটা কী, এটা অনিমেষদাই স্থির করেছেন। সেই লক্ষ্যটাকে যারা মানবে না, নবদিশায় তাদের থাকার অধিকার আছে কিনা সেটাও তা ভাবতে হবে। কিংবা তেমন মানুষদের বৈঠকে আদৌ আসতে দেবেন কেন অনিমেষদা? এবং এই ডিসিশন নেওয়ার হক অনিমেষদার আছে।"

অনিমেষ তাড়াতাড়ি বলল, "না, না, হক-টকের কথা আমি বলছি না। আমরা সবাই মিলেই তো নবদিশা। আমার মুক্ত চিন্তা করি, মুক্তির চিন্তা করি। ধ্বংসের ভাবনাকে কি সেখানে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত? তাই কোথাও না কোথাও তো দাঁড়ি টানতেই হবে। স্বাধীনতা মানে যেমন অ্যানার্কি নয়, তেমনই মুক্ত চিন্তা মানে তো বলগাহীন ভাবনা নয়।"

"নবদিশার সভাতেই না হয় এসব স্থির হবে!" পল্লবের দাড়ির ফাঁকে আবছা হাসি, "ভোটামুটি কিন্তু সেদিন হবেই।"

"বি রিজনেব্‌ল পল্লব। নবদিশায় এসব হয় না।"

"উঁহু, অ্যাদ্দিন হত না। এখন সদস্যরা চাইছে, হবে। কখনও-কখনও তো শুরু হয়ই," পল্লব উঠে দাঁড়াল, "তা হলে আজ চলি। আশা করি, সোমবার দেখা হবে।"

পল্লবের সঙ্গে তনুকাও বিদায় নিল। অনিমেষ ঘাড় ঝুলিয়ে বসে। দু'দিকে মাথা দোলাতে-দোলাতে বলল, "আমি কিন্তু এরকমটা চাইনি রূপসা। ভেবেছিলাম, সবাই মিলে একটা সুস্থ চিন্তা নিয়ে..."

রূপসা বলল, "জানি তো। আমি তো আপনাকে আগেই বেনোজল নিয়ে সাবধান করেছিলাম। সোমবার কী হবে, বুঝছেন তো? আপনিই নবদিশা থেকে আউট হয়ে যাবেন।"

মধ্যবয়সী অনিমেষের মুখে মলিন হাসি, "বলছ?"

"অবশ্যই। ওদের তো শুধু একটা প্ল্যাটফর্মের দরকার ছিল। নবদিশার মোটামুটি পরিচিতি হয়েছে, এবার ওরা এই মঞ্চটাকে ব্যবহার করবে। আমিও অবশ্য তা হলে আর থাকব না।"

অনিমেষ নিশ্চুপ। মানুষটার ব্যথিত মুখে দেখতে খারাপ লাগছিল রূপসার। আর কিছু না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

বাসস্টপে দাঁড়িয়েও রূপসা ভাবছিল। একটা মানুষ লক্ষ্য রচনা করে, তাকে ঘিরে জড় হয় আর পাঁচজন। কিন্তু এই সংঘবদ্ধ চেহারাটাই বুঝি ভয়ঙ্কর। যেইমাত্র তৈরি হবে সংঘ, এসে পড়বে স্বার্থের দলাদলি, সংঘের ক্ষমতা দখলের লিপ্সা। মূল লক্ষ্যটাই যে তখন কোথায় হারিয়ে যায়, কেউ টেরও পায় না। নাঃ, রূপসাকে একাই এগোতে হবে। বাধাবিঘ্ন এলেও একাই ঠেলতে হবে...আরে, কে যেন সত্যি-সত্যি ঠেলছে রূপসাকে? ঘাড় ঘোরাতেই খুশির ঝাপটা। এণাক্ষী। কী আশ্চর্য, জিন্‌স-টপ নয়, সালোয়ার-কামিজ।

রূপসাকে জড়িয়ে ধরেছে এণাক্ষী। অনুযোগের সুরে বলল, "তুই কী রে? আমাকে একদম ভুলে গেলি?"

রূপসা হেসে বলল, "তুইও তো আর ফোন করিস না!"

"অ্যাই, মিছে কথা বলিস না। নিউ ইয়ারে তোকে মেসেজ করেছিলাম, তুই জবাব দিসনি।"

"সরি, সরি। আমি খুব কুঁড়ে হয়ে গেছি রে!" রূপসার স্বরে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি। আলগা কৌতূহল নিয়ে বলল, "তা তোর কোর্স তো বোধহয় শেষ হয়ে এল! কবে থেকে উড়ছিস আকাশে?"

"ধুস, ইনস্টিটিউটটাই জালি। কড়কড়ে দেড় লাখ টাকা নিল, ব্রোশিওরে কত কী প্রতিশ্রুতি, এখন দেখতে পাচ্ছি সবই ঢপ। নাম কা ওয়াস্তে একটু-আধটু ক্যাম্পাসিং হয় বটে, কিন্তু দু'-চারজনের বেশি জব পায় না।"

"যাঃ, তোর পুরো টাকাটাই লস?"

"তা নয়, এয়ারহোস্টেসের কোর্সের সঙ্গে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টও পড়ায় তো, তারই জোরে একটা চাকরি মিলছে। ফ্লোরেন্স গ্রুপ কলকাতায় হসপিটাল খুলেছে, বাইপাসের ধারে...ওখানেই।"

"হাসপাতালে কী করবি?"

"কাউন্টার জব। পেশেন্টের বাড়ির লোকজনদের অ্যাটেন্ড করা, বিলিং-টিলিং..."

"এমা, তোর এত স্বপ্ন ছিল এয়ারহোস্টেস হয়ে এদেশ-ওদেশ ঘুরবি!"

"কাম অন রূপসা। একটা স্বপ্নই আঁকড়ে বসে থাকলে চলে নাকি? ড্রিমটাকে কাটছাঁট করে নিলেই হল। ভাবছি, এবার বিয়ে-টিয়ে করে সেটলও করে যাব।"

"তোর স্টেডি বয়ফ্রেন্ড হয়েছে নাকি?"

"ইয়েস ম্যাম। দ্বৈপায়ন আমায় প্রোপোজও করেছে। আই টি সেক্টরে আছে দ্বৈপায়ন। প্রোগ্রাম অ্যানালিস্ট। বাবা-মা খুব খুশি। ওরাও কায়স্থ কিনা। এবছর ডিসেম্বরেই হয়তো আমরা..."

মজা লাগল রূপসার। প্রেমটাও জাতগোত্র দেখে? এণাক্ষী পারেও বটে। মেয়েটার কাছ থেকে শেখারও আছে, স্বপ্নভঙ্গের বেদনাটা কেমন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে!

এণাক্ষীর হাত ধরে ঝাঁকাল রূপসা, "কনগ্র্যাটস। নেমন্তন্ন পাচ্ছি তো?"

"শিওর। তোর সেই পিএইচডি হয়ে গেছে?"

"না রে। এখনও হয়তো দু'-তিন বছর লাগবে।"

"উফ, পড়ে পড়েই তুই ঝিরকুটে মেরে যাবি। আর তুই কী একটা যেন করতিস না? ওসব নিয়ে নতুন কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি তো?"

পলকের জন্য অনিমেষকে মনে পড়ল রূপসার। পল্লব, তনুকাকেও। বুঝি বা নান্টুকেও। অশান্তি যে কোন পথে আসে, তার কি ঠিকঠিকানা আছে! স্মিত মুখে রূপসা বলল, "নাঃ। এখনও তো সব ঠিকঠাক।"

মাথার উপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে। শব্দটা শুনেই দু'জোড়া চোখ আচমকা ঊর্ধ্বপানে। পরক্ষণ চোখাচোখি হল দু'জনের। দু'-এক সেকেন্ড পরে শব্দ করে হেসে উঠল এণাক্ষী। সঙ্গে-সঙ্গে রূপসাও।

রাতে খেয়ে উঠে রূপসা মাজাঘষা করছিল লেখাটা। বিষয়টা তার খুব পছন্দের নয়, ভেবেছিল আদিবাসী বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে কাজ করবে, কিন্তু এমন একটা টপিক বেছে দিলেন প্রতিম স্যার। তবু চেষ্টা করতেই হবে, সিপাই মিউটিনির পরিপ্রেক্ষিতে অন্য বিদ্রোহগুলো যতটা যা আলোকপাত করা যায়। প্রতিম স্যার তো দিয়েছেনই, ইন্টারনেট ঘেঁটে আরও কয়েকটা বইয়ের নাম জোগাড় করল রূপসা। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যদি যায়ই, একসঙ্গে দেখে নেবে বইগুলো।

রূপসার ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। সম্পূর্ণা টেবিলে বসে পড়ছে, বাথরুম ঘুরে এসে রূপসা একবার দেখল তাকে। মেয়েটা আজকাল পড়তে-পড়তে যেন আনমনা হয়ে যায়। বই খোলা, তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে। কী এত চিন্তা কে জানে! প্রেমেট্রেমে পড়েছে? মুখ ফুটে তো কিছু বলে না। বড় একটা হাই তুলে শুয়ে পড়ল রূপসা। বালিশ মাথা রাখতেই ফের উঁকি দিয়েছে নবদিশা। কী ঘটতে পারে সোমবারের মিটিংয়ে? অনিমেষদাকে মনে হয় হঠতেই হচ্ছে। কেমন প্রতিক্রিয়া হবে অনিমেষদার? বেরিয়ে এসে নতুন কিছু গড়তে চাইবে? নাকি ভেতরে থেকে পল্লব-তনুকাদের মতো ঘুঁটি সাজাবে? রূপসার কি তখন অনিমেষদার পাশে থাকা উচিত? কিন্তু সে তো মনস্থির করেছে...

এলোমেলো ভাবনার মাঝে কখন যে রূপসা ঘুমের অতলে। হঠাৎই নিদ্রা ছিঁড়ে গেল। সম্পূর্ণা ঠেলে-ঠেলে ডাকছে, "রূপসাদি? রূপসাদি? ওঠো।"

রূপসা চমকে জেগে বলল, "কী হল?"

"মাসিমা এসে ডাকছিলেন। মেসোমশাই নাকি কেমন করছেন।"

শুনেই তন্দ্রার ছিটেফোঁটাও উধাও। প্রায় লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নামল রূপসা, চটি গলিয়ে দৌড়েছে। বড় শোওয়ার ঘরখানায় এসে দেখল, অনুব্রত বুকে হাত চেপে শুয়ে, মাথার ওপর পূর্ণ গতিতে পাখা চলা সত্ত্বেও করবী তাকে হাওয়া করছে, খাটের পাশে পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিমা।

রূপসা উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে মাসিমা?"

"দেখো না কী বিপদ!" করবীর গলা কাঁপছে, "খেয়েদেয়ে উঠে বলছিল বুকে ব্যথা ব্যথা করছে, অ্যান্টাসিড খেয়ে শুয়েও পড়ল। আমিও ঘুমোচ্ছিলাম। এই খানিক আগে শুনি খুব উ আ করছে... জিজ্ঞেস করতেই বলল, বুকে নাকি ভীষণ পেন। এখন তো ঘামও হচ্ছে মানুষটার..."

সম্পূর্ণা এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে-পিছনে। ভিতু-ভিতু গলায় বলল, "হার্ট

অ্যাটাক নয় তো?"

করবীর কানে গেছে কথাটা। বিহ্বল স্বরে বলল, "বুঝতে পারছি না গো। এই রাত দুপুরে কী যে করি!"

"লোকাল ডাক্তারকে কল দিয়েছেন?"

"কাছেপিঠে কোনও ডাক্তারকে তো চিনি না। আমরা আগে হরতুকিবাগানে থাকতাম তো, ওখানকারই এক ডাক্তার আমাদের দেখেন-ট্যাখেন। তাঁকে ফোন করেছিলাম, সুইচড অফ।"

"আঃ, বড্ড বেশি টেনশন করছ!" হঠাৎই গলা শোনা গেল অনুব্রতর। কোঁকাতে-কোঁকাতে বলল, "কেন মেয়ে দুটোকে ব্যতিব্যস্ত করছ? এটা গ্যাসের কিক, দিব্যি বুঝতে পারছি। ওষুধ খেয়েছি, আস্তে-আস্তে কমে যাবে।"

"মেসোমশাই, আপনি চুপ করুন তো," রূপসা ধমকে উঠল, "একটাও কথা নয়। বুকের কোন দিকে ব্যথা হচ্ছে?"

"বাঁ দিকে...মাঝখানে.. যেন কেউ খামচে-খামচে ধরছে!"

"উঁহু, লক্ষণ সুবিধের নয়," রূপসা করবীকে বলল, "হসপিটালে নিয়ে যাওয়া উচিত। অ্যাম্বুলেন্স ডাকি?"

"না, না, আমি কোথাও যাব না," অনুব্রত বাচ্চাদের মতো আর্তনাদ জুড়েছে, "হসপিটালে গেলেই মরে যাব...বলছি তো, কিছু হয়নি। আমি ঠিক হয়ে যাব।"

"এই হল জ্বালা!" করবী বলল, "হাসপাতালের নাম শুনলেই এমন করে। আগের বার যখন বুকে ব্যথা হয়েছিল, তখনও ঠিক এরকম করেছে। ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে দেয়নি।"

কিন্তু এবাবে তো হাত গুটিয়ে বসে থাকাও যায় না। রূপসা ভাবল এক সেকেন্ড। তারপর বলল, "ঠিক আছে, আমি দেখছি।"

বলেই ঝটিতি ঘরে ফিরে মোবাইলটা তুলেছে। বিতানের কথাই যে কেন সবার আগে মনে পড়ল এখন? উদ্দাম প্রোগ্রাম সেরে হয়তো এখন সে নেশায় চুর হয়ে ঘুমোচ্ছে, তবুও?

ইংরেজি গান বাজছে ওপারে। বেজেই চলেছে। বিতানকে ফোন করাটাই মূর্খামি, অ্যাম্বুলেন্সই ডাকতে হবে বোধ হয়।

না, ধরেছে ফোন। জড়ানো গলা ভেসে এল, "আমার কী সৌভাগ্য! মধ্যনিশীথে আমায় মনে পড়ল তা হলে?"

"ভাট বকিস না। আমি যে বাড়িতে থাকি, মেশোমশাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চেস্ট পেন। সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক।"

দু'-এক মুহূর্ত কোনও শব্দ নেই। ফের বিতানের গলা। আর জড়তা নেই, দিব্যি সতেজ, "তুই আমায় বাড়ির নাম্বারটা বল।"

"কেন?"

"যা বলছি, কর," রূপসার মুখ থেকে ঠিকানাটা জেনে নিয়ে বিতান বলল, "আমি পৌঁছে যাচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি পারি। ঘাবড়াস না, গিয়ে যা করার করছি...ভদ্রলোকের সেন্স আছে তো?"

"তা আছে। কথা-টথা বলছেন।"

"ও কে। আসছি।"

ফোন ছেড়ে আবার শোওয়ার ঘরে এল রূপসা। করবী নয়, এখন সম্পূর্ণা হাওয়া করছে অনুব্রতকে। রূপসা গিয়ে বসল খাটের প্রান্তে। মৃদু গলায় বলল, "বুকে একটা হাত বুলিয়ে দেব মেসোমশাই?"

অনুব্রত বারণ করল, "না, না, আমি ঠিক আছি।"

গলা শুনেই বোঝা যায়, কষ্ট হচ্ছে মানুষটার। আর অনুমতির অপেক্ষা না করে বুকে হাত বোলাতে শুরু করল রূপসা। শুকনো মুখে বসে আছে করবী, একটু যেন উদভ্রান্তও। রূপসারও বুক ঢিপঢিপ করছিল। বিতানের উপর ভরসা করে সময় নষ্ট করছে না তো? যদি খারাপ কিছু ঘটে যায়? বিতান যা ছেলে, সে কখন আসবে তার ঠিক কী? খোয়াড়ি কাটাতেই না তার আধ ঘণ্টা কেটে যায়। ভুল হল, ভুল হল! অ্যাম্বুলেন্স ডাকাই উচিত ছিল।

অনুব্রত নড়াচড়া করছে। রূপসা ঝুঁকল, "কিছু বলছেন মেশোমশাই?"

"হ্যাঁ, একটু বাথরুমে যাব। বমি পাচ্ছে।"

"চলুন।"

আস্তে-আস্তে উঠল অনুব্রত। তাকে ধরে-ধরে নিয়ে যাচ্ছে করবী। বাথরুম অবধি পৌঁছতে পারল না, হড়হড় উগরে দিয়েছে রাতের খাবার। হাঁপাচ্ছে। বেসিনে অনুব্রতকে মুখ ধুইয়ে এনে করবী ফের শুইয়ে দিল।

অনুব্রত যেন নেতিয়ে পড়েছে। রূপসা জিজ্ঞেস করল, "একটু বেটার ফিল করছেন মেসোমশাই?"

সাড়া দিল না অনুব্রত। শুধু ওঠানামা করছে বুকটা। চিন্তিত মুখে রূপসা ব্যালকনিতে এল। ফাল্গুনের নরম বাতাসও যেন তপ্ত লাগছে। তারায়-তারায় ভরা আকাশটার দিকে একটুও তাকাতে ইচ্ছে করছে না। উফ, সময় যেন পেরোয় না। এখনও কি আধ ঘণ্টা হয়নি?

ঠিক তখনই একটা গাড়ি এসে থামল গেটের ওপারে। নেমেছে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা বিতান। সঙ্গে এক ভদ্রলোক, হাতে ব্রিফকেস। ডাক্তার? বিতানের হাতেও একটা বাক্স। দৌড়ে গিয়ে প্রতিমাকে দরজা খুলে দিতে বলল রূপসা। সিঁড়ির মুখে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

হুড়মুড়িয়ে উঠল বিতান। সঙ্গে বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে বলল, "তাপসদা। ডক্টর তাপস ব্যানার্জি। কার্ডিওলজিস্ট।"

দ্রুত পায়ে ঘরে গেল তাপস। পরীক্ষা করছে অনুব্রতকে। নাড়ি টিপল, প্রেশার মাপল, চোখ দুটো দেখল টেনে-টেনে। তার ফাঁকে-ফাঁকে শুনে নিচ্ছে উপসর্গ, রোগীর অতীত ইতিহাস। মাথা দুলিয়ে বলল, "প্রেশার আর পালস একটু কমের দিকে। সম্ভবত বমি হয়েছে বলেই। আপনারা জিভের তলায় সরব্রিট্রেট দেননি কেন?"

করবী কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "ছিল না। মানে, এরকম তো হয় না..."

"তবু ওটি ঘরে রাখবেন। এই বয়সে ওগুলো সর্বদা হাতের কাছে থাকা দরকার। সরবিট্রেট আর ডিসপ্রিন জিভের নীচে রাখলে রিলিফ হবে।"

পোর্টেবল ইসিজি মেশিনও এনেছিল ডাক্তার। হাল বুঝে নিল হৃৎপিণ্ডের। বিতান আর রূপসা খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে, রূপসার কানের কাছে মুখ এনে বিতান বলল, "এই সেই তোর তে-এঁটে বুড়োটা? তোর সঙ্গে খুব তর্ক করে?"

"আঃ বিতান!" রূপসা চিমটি কাটল, "শুনতে পাবেন যে।"

ব্যস, বিতান নীরব।

ইসিজি দেখে তাপস জানাল, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হার্ট অ্যাটাকও হয়নি। সম্ভবত অতিরিক্ত অম্বল থেকেই এই বিপত্তি। তবু কয়েকটা টেস্ট করাতেই হবে। রক্তের, হৃদ্‌যন্ত্রের..." দু'খানা ওষুধও লিখল প্রেসক্রিপশনে। সঙ্গে নির্দেশ, "আপাতত দিনসাতেক সিঁড়ি ওঠানামা একটু কম করতে হবে, অকারণ উত্তেজনাও নয়।"

চলে গেছে বিতান আর তাপস। করবী আপ্লুত, বার বার ধন্যবাদ জানাচ্ছে রূপসাকে।

পরদিন সকালে রূপসার পানে একরাশ কৌতূহল ধেয়ে এল করবীর। মুচকি হেসে বলল, "কালকের ওই ঝুঁটিওয়ালা ছেলেটা কে? তোমার বন্ধু?"

রূপসা সন্তর্পণে জবাব দিল, "না, পরিচিত।"

"শুধুই পরিচিত কি ডাকলেই রাত দুপুরে ডাক্তার নিয়ে ছুটে আসে?"

রূপসা সম্পূর্ণাকে দেখল। সেও মিটিমিটি হাসছে। ঈষৎ গম্ভীর হয়ে রূপসা বলল, "ও একটু অ্যাবনরমাল টাইপ।"

"আমার তো তা মনে হল না। কী সুন্দর করে কথা বলছিল। দায়িত্বজ্ঞানও আছে। অত রাতে ওইটুকু সময়ের মধ্যে ডাক্তার নিয়ে চলে এল!"

"ডাক্তার তো ওর চেনা। হয়তো আত্মীয় কিংবা পাড়ার কেউ..."

"তাও...বুদ্ধি করে ধরে এনেছে তো। আর ছেলেটা পাগল-ছাগল হলে ডাক্তারও কি অমনই নিজের গাড়ি চালিয়ে তার সঙ্গে ছুটে আসে?"

কী বলবে রূপসা? এ তো তার কাছেও রহস্য। বিতানের যে একটা অন্য ধরনের ইমেজ আছে, তা কি সে জানত? এই বিতান তো তারও অচেনা!

করবী ফের জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটি থাকে কোথায়?"

রূপসা অসহজ বোধ করল। এবার নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসবে, কবে কী ভাবে আলাপ, বিতান কী করে...এত উত্তর দেওয়া পোষায়?

দায়সারা ভাবে রূপসা বলল, "ওই তো, পাটুলি না কোন দিকে যেন।"

"ছেলেটিকে দেখতে কিন্তু বেশ। চমৎকার স্বাস্থ্য, মুখখানাও মিষ্টি। লম্বা চুল কেটে ফেললেই তো পারে। আরও ভাল দেখাবে।"

রূপসার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "বলেছি, পাত্তা দেয় না!" তারপর ঠাট্টার স্বরে বলল, "ও নাকি চায় না ওকে হ্যান্ডসাম দেখাক।"

"আজব তো! ওকে একদিন এবাড়িতে আনো, আমি কষে বকে দেব।"

কী কাণ্ড! মাসিমা তাদের সম্পর্ক নিয়ে কিছু একটা আন্দাজ করে বসেছেন নাকি? উঁহু, ভুলটা ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু ঠিকটাই বা কী? কাল রাতের বিতান যে ধন্দে ফেলে দিয়েছে রূপসাকে!

এবার চৈত্রমাসে গরমই পড়ল না সেরকম। ক'দিন টানা তাপ ছড়াতে না-ছড়াতে প্রায়ই কালবৈশাখী হাজির। সঙ্গে ঝমঝমাঝম বৃষ্টি। রাতভর চমৎকার হাওয়া বয়। জোরে ফ্যান চালালে ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগে।

অনুব্রতকে নিয়ে করবীর দুশ্চিন্তা কমেছে অনেকটা। রক্ত পরীক্ষায় তেমন

খারাপ কিছু মেলেনি। তবে কোলেস্টেরলের মাত্রা এখনও উঁচুর দিকেই। ফুসফুসের এক্সরে, হৃদযন্ত্রের ইকোকার্ডিওগ্রাম করানো হয়েছে ডাক্তারের কথা মতো। তার ফলও খুব ভয় ধরানো নয়। ক'দিন বিশ্রাম-টিশ্রাম নিয়ে অনুব্রতও বেশ চাঙ্গা, আবার বেরোচ্ছে নিয়মিত। অবশ্য গাড়ি আর চালাচ্ছে না। ডাক্তারই বলেছে, অকারণ মানসিক চাপগুলো বেশি না নেওয়াই ভাল, বরং হাঁটাহাঁটিটা আরও বাড়িয়ে দিলে ক্ষতি নেই। একটা ড্রাইভার সেন্টারের সঙ্গে কথা হয়েছে, করবী বাপের বাড়ি গেল কিংবা অনুব্রত এদিক ওদিক, তারাই চালক পাঠিয়ে দেবে। বন্দোবস্তটা অনুব্রতর মোটেই মনমতো নয়। তার ধারণা, তাকে বুড়ো বানিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করছে করবী। তবে প্রথমটা একটু গাঁইগুঁই করলেও মেনে নিয়েছে অনুব্রত। এই বয়সে ডাক্তারের নির্দেশ অগ্রাহ্য করবে, করবীর আপত্তি মানবে না, এত দুঃসাহসী অনুব্রত নয়।

বাবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনাটা ছেলেদের জানায়নি করবী। অনুব্রতও বারণ করেছে। কী হবে তাদের চিন্তা বাড়িয়ে! থাক না যে যার মতো। তেমন মারাত্মক একটা কিছু ঘটলে, খবর তো তারা পাবেই।

যাই হোক, আবার নিস্তরঙ্গই কাটছে করবীর দিনরাত। বরকে নিয়ে, রূপসা-সম্পূর্ণাকে নিয়ে, ভোরবেলার সঙ্গীদের নিয়ে। শুধু মাঝে ক'দিন ফ্লু মতো হয়েছিল। ক'টা বড়ি গিলতে হল আর শুয়ে থাকতে হল বিছানায়। তারপর আবার যে কে সেই।

চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন হঠাৎই পলকা ঢেউ। আগাম কোনও খবর-টবর নেই, হঠাৎ রাজা কলকাতায়। কী ব্যাপার? না মুম্বইয়ে তাদের ব্যাঙ্কের একটা গ্লোবাল মিট ছিল, সিডনি ফেরার আগে একবার বাবা-মা'কে দেখতে এসেছে। করবী তো মহা ব্যস্তসমস্ত। মাত্র একটা রাতের জন্য এসেছে রাজা, কালই রাতের ফ্লাইট ধরে ভায়া সিঙ্গাপুর ফিরে যাবে নিজের বাড়ি, একটু ভালমন্দ কিছু না খাওয়ালে চলে! অমনই হুকুম জারি হল প্রতিমাকে, ফ্রিজ থেকে কাতলা মাছটা বের করে দইমাছ বানিয়ে দে, নারকোল দিয়ে ছোলার ডাল রাঁধ, আর রাজার প্রিয় পদটি যেন অবশ্যই থাকে। ঘুঁটের সাইজের পোস্তর বড়া। চেটেপুটে খেল রাজা, নয়ন সার্থক হল করবীর। তবে রাতে শুতে তার একটু অসুবিধেই হল যেন। এত জিনিসপত্র ঠাসা ঘরে থাকার অভ্যেসটাই চলে গেছে কিনা!

পরদিন সকাল থেকে রাজার টিকিটি নেই। জলখাবারটি খেয়ে সেই যে বেরিয়ে গেল, এল সেই সন্ধের মুখে-মুখে। পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নাকি মোলাকাত করে এল। ফিরে চা খেয়েই গোছগাছ সারছে। অনুব্রত তড়িঘড়ি একটা টকিং ডল এনেছিল নাতনির জন্য, সেটাও পুরল ট্রলি সুটকেসে।

হাসতে-হাসতে রাজা বলল, "ফালতু এসব কিনতে গেলে বাবা। মিমির টয়েজ তো উপচে পড়ছে।"

"তা হোক, তুই নিয়ে যা," অনুব্রত যেন একটু অভিমানী স্বরেই বলল, "বাবা-মাকে দেখতে আসা যেমন তোর ডিউটি, নাতনিকে কিছু দেওয়াটাও তেমন..."

"হয়েছে, হয়েছে। আর সেন্টিমেন্টাল হতে হবে না। নিলাম তো," বলেই রাজার করবীকে প্রশ্ন, "আচ্ছা মা, মাধ্যমিকে অঙ্কে একশো পেয়েছিলাম বলে স্কুল আমায় একটা প্রাইজ দিয়েছিল, মনে আছে?"

"হ্যাঁ। একটা মেডেল পেয়েছিলি।"

"ওটা কোথায়?"

"আমার আলমারিতে তোলা আছে।"

"আর ইন্টার স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জেতা সেই কাপটা?"

"ওটাও আমার আলমারিতে। কেন রে?"

"ও দুটো বের করে দাও। নিয়ে যাব। এখানে ফেলে রেখে কী লাভ! বরং আমার ড্রয়িং হলের শোকেসে থাকবে। গোল্ডেন মেমরি বলে কথা।"

আলমারি খুলল করবী। সযত্নে রাখা কাপ-মেডেলে হাত বোলাল একটু। সব স্মৃতিই উপড়ে তুলে নিয়ে যেতে চায় রাজা। শুধু দু' পিস জ্যান্ত অ্যান্টিকই যা রয়ে গেল এবাড়িতে!

একটা শ্বাস গোপন করে জিনিস দুটো নিজের হাতে সুটকেসে ভরে দিল করবী। চেন আটকাচ্ছে রাজা। লঘু গলায় বলল, "বাবাকে যে-ওয়াইনটা দিলাম, ওটা খেয়ে নিতে বোলো। আগেরটাই নাকি এখনও জমিয়ে রেখেছে?"

"হুঁ। ওয়াইন তো খায় না বড় একটা...খুললে তো আর রাখা যায় না..."

"যতটুকু ইচ্ছে হবে খাবে, বাকিটা ফেলে দেবে। তোমাদের এই বছরের পর বছর জমিয়ে রাখার হ্যাবিটটা কিন্তু মিনিংলেস।"

কেন যে অনুব্রত প্রাণে ধরে খুলতে পারে না, রাজা তার কী বুঝবে? মুখে অনুব্রত কিচ্ছু না বললেও করবী জানে, ওই শেওলারঙা বোতলটায় দৃষ্টি পড়লেই হাজার-হাজার মাইল দূরে প্যারাম্যাটা নদীর ধারের একটা ছোট বাংলো বাড়ি দোলে অনুব্রতর চোখে। ওটা তো ওয়াইন নয়, ওটাই তো রাজা!

করবী গলা ঝেড়ে বলল, "তা তুই খাবি কখন?"

"এবার বসে যাব।"

"কেন রে? তোর তো সেই সাড়ে এগারোটায় ফ্লাইট?"

"তা হোক। ন'টার মধ্যেই বেরব। তোমাদের এখানে ট্যাক্সি মিলতে চায় না...তার উপর বাগুইআটি মোড়ে আজকাল নাকি খুব জ্যাম হচ্ছে..."

রাজার এত বেশি 'তোমাদের' সহ্য হতে চায় না করবী। বলল, "ঠিক আছে। রেডি করছি।"

মায়ের গালে একটা টোকা দিয়ে রাজা হেসে চলে গেল বাইরের ঘরে। টিভি দেখছে, বাবার সঙ্গে কথাও বলছে টুকটাক।

করবী উঠল তেতলায়। নিজের হাতে চিংড়িমাছের মালাইকারি রেঁধেছে আজ, গ্রেভিটা চেখে দেখল একবার। হ্যাঁ, মিষ্টি একদম ঠিকঠাক। রাজা এমনটাই ভালবাসে। এবার ফিশফ্রাইটা ভেজে নিলেই হয়।

রাজা খেতে বসল আট'টা নাগাদ। পোশাক-আশাক পরে, একেবারে তৈরি হয়ে। টেবিলে সাজানো ভোজ্যবস্তুগুলো দেখে আঁতকে উঠল যেন, "করেছ কী? সর্ষে পাবদা, মালাইকারি, ডিপফ্রাই...আমাকে মেরে ফেলবে নাকি?"

"বালাই ষাট, তুই কোন দুঃখে মরবি!" করবী হাসছে, "সবই তো তোর ফেভারিট আইটেম।"

"ছিল, আইরিনের পাল্লায় পড়ে তেল-মশলার অভ্যেস একদম ছেড়ে গেছে। কাল দইমাছ খেয়েই আমার পেট কুনকুন করছিল," রাজা আঙুল তুলে দেখাল, "পাবদা আর ফ্রাই হটাও। শুধু একটা চিংড়িমাছ তুলে নিচ্ছি। তোমার অনারে।"

"গ্রেভিটা একটু টেস্ট কর।"

"নো ওয়ে। লম্বা জার্নি, প্লেনে স্টমাক আপসেট হলে আর দেখতে হবে না। পাতলা-পাতলা ঝোল কিছু নেই?"

"তোর বাবার জন্য মুরগির স্টু মতো..."

"ওটাই আমার সুট করবে।"

অগত্যা অখাদ্য রান্নাটাই দিতে হল রাজাকে। ভারী তৃপ্তি করে খাচ্ছে রাজা। চল্লিশ বছরের ছেলেকে দেখছিল করবী। মা হওয়ার কী জ্বালা! ইদানীং রাজার উপর এত বিরাগ জন্মেছে, তবু ছেলেকে দেখে-দেখে যেন আশা মেটে না। কপাল বেশ চওড়া হয়ে গেছে, চুলে একটা দুটো রুপোলি রেখা, মুখমণ্ডলেও আর আগের সেই ঝলমলে তারুণ্য নেই, বরং বেশ ওজনদার ব্যক্তি মনে হয় এখন। তবু সেই মাকে আঁকড়ে থাকা কিশোরটাই যেন উঁকি মারছে কোত্থেকে। উফ, মায়া যেন উথলে ওঠে! এ বুঝি শর্মিষ্ঠার ব্যভিচারী বর নয়, আইরিনের বাধ্য স্বামী নয়, মিমির পপ নয়, অনুব্রতর রাজা নয়, এ শুধু করবীরই ছেলে। করবীরই রক্তমাংস দিয়ে গড়া এক প্রাণ।

ঈষৎ আর্দ্র স্বরে করবী বলল, "আবার কবে আসছিস?"

"দেখি। এরকমই কখনও সময় সুযোগ পেলে...কাল কেমন সারপ্রাইজ দিয়েছি বলো?"

"হুম, তুই নিজেই তো আমার সারপ্রাইজ," করবী চিলতে হাসল, "এমন এসেই পালাস না রে। একটু বেশিদিনের জন্য আয়। মিমিকে নিয়ে... আইরিনকেও আনবি..."

"ওদের ব্যাপারটা বলা কঠিন। এখানে যা পলিউশন, তার উপর ইন্ডিয়ার জলও আইরিনের একদম সহ্য হয় না। মনে নেই, গতবার কেমন ডায়রিয়া মতো হয়ে গিয়েছিল?" কয়েক পলক থেমে থেকে রাজা বলল, "যদি বা সবাই মিলে আসি, আমরা কিন্তু হোটেলে উঠব। আমি তাও এবার ম্যানেজ করে চালিয়ে দিলাম। ওরা গাদাগাদি করে থাকতে পারবে না।"

এমন একটা জবাবের জন্য করবী যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না, তা তো নয়। তবু যেন একটা ধাক্কা খেল। ঢোক গিলে বলল, "সেভাবেই নয় আসিস। কিন্তু আয়।"

"তোমরাই বরং চলে এসো। মুম্বই নেমে ছোটুকে ফোন করেছিলাম। বললাম, সিঙ্গাপুর তো ঘুরে এলি, এবার আর একটু কষ্ট করে সিডনি বেড়িয়ে যা। ও তো খুব এক্সাইটেড। বলল, ডিসেম্বরে যেতে পারে। তোমরাও যদি তখন সিডনিতে আসো, সবাই মিলে একটা দারুণ ক্রিসমাস কাটাব। তেমন হলে ক্যারাভান ভাড়া করে সেন্ট্রাল অস্ট্রেলিয়ার দিকেও যেতে পারি।"

শুনে একটু একটু লোভ হচ্ছিল করবীর। রাজা ছোটুকে আবার একসঙ্গে পাবে? নাঃ, সোনালি আশা থেকে দূরে থাকাই ভাল। বিচ্ছেদের বেদনাও যে বড্ড বেশি বুকে বাজে।

করবী আলতোভাবে বলল, "দেখি, তোর বাবার সঙ্গে কথা বলি। সে তো আর লম্বা প্লেন জার্নি করতেই চায় না।"

"বাবা যেন কেমন বুড়োটে মেরে গেছে। শরীর-টরীর ঠিক আছে তো?"

গত মাসের সেই রাতটা মনে পড়ল করবীর। ভাসা-ভাসা স্বরে বলল,

"হ্যাঁ, আছে। এই বয়সে যেমন থাকে।"

"রেগুলার চেক-আপ টেক-আপ করাচ্ছ?"

"হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ," প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চাইল করবী। মুখ ফসকে কী বেফাঁস কথা বেরবে, অমনই চটে লাল হয়ে যাবে কর্তামশাই। তাড়াতাড়ি বলল, "হ্যাঁ রে, আইরিন নাকি আবার চাকরি বদলাচ্ছে?"

"বাবা বলল বুঝি?" হাসছে রাজা, "আইরিনের মাথায় ক্যারা আছে। কোনও অফিসে এক-দু'বছরের বেশি ওর মন বসে না। এবার কোথায় জয়েন করছে জানো? সিডনি রয়্যাল ক্যাসিনোয়।"

"জুয়ার আড্ডায়?"

"দূর, ওর তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব।"

"তবু...কত রকম লোক আসে...গুন্ডা-বদমাশরা ভিড় করে..."

"আইরিন ওসব কেয়ারই করে না। আগে তো বার নাইট ক্লাবেও কাজ করেছে," রাজা কাঁধ ঝাঁকাল, "ও তো আর এখানকার মেয়েদের মতো জড়ভরত নয়।"

"এখানকার মেয়েরাও এখন যথেষ্ট স্মার্ট রে।"

"বোকো না মা। যা এক পিস স্যাম্পল দেখেছি।"

করবীর ভুরু জড়ো হল, "কার কথা বলছিস তুই?"

"যেটিকে আমার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলে। কী গাঁইয়া, কী গাঁইয়া। সাধে কি আমার সঙ্গে পটল না! ভাগ্যিস চটপট কাটাতে পারলাম, নইলে আমার লাইফ হেল হয়ে যেত।"

করবী কথাটা গিলতে পারল না। সামান্য দোনামোনা করে বলেই ফেলল, "শর্মিষ্ঠার সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। ও কিন্তু আমায় তোদের অবনিবনার কারণটা জানিয়েছে। তুই ওর সঙ্গে কীরকম বিহেভ করেছিস, সেটাও।"

রাজা জোর চমকেছে! কয়েক সেকেন্ড স্থির তাকিয়ে থাকল মা'র দিকে। তারপর নীরবে শেষ করছে আহার।

করবীও আর কথা বলছিল না। কোল্যাপসিবল গেটে শব্দ হচ্ছে। সম্পূর্ণা ফিরল। দোতলায় উঠে চটি বদলে মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছে ঘরে। একবারও চোখ তুলে তাকাল না।

রাজাও দেখছিল সম্পূর্ণার যাওয়াটা। ডাইনিং টেবিলে হাল্কা গুমোটটা কাটাতেই বুঝি বলে উঠল, "মেয়েটা একটু বেশিই শান্ত, তাই না?"

"হুম, খুব শাই।"

মুখে বলল বটে, কিন্তু মগজে যেন একটা আলগা টোকাও টের পাচ্ছিল করবী। ইদানীং মাঝে-মাঝেই বেশ দেরিতে ফিরছে সম্পূর্ণা। উঁহু, মাঝে-মাঝে নয়, সপ্তাহে একদিন। গত সপ্তাহে শুক্রবার রাত করে ফিরেছিল, আজ বুধবার...যেদিন বাপের বাড়ি গেল করবী, সেদিনও রাত করল। সেটা সোমবার ছিল। প্র্যাক্টিকাল ক্লাস? সপ্তাহে-সপ্তাহে কি দিন বদলে যায় প্র্যাক্টিকালের? এই দিনগুলোতে যেন কেমন অবসন্ন থাকে মেয়েটা, রাতে কিছু খেতে চায় না। জোরজার করে বসালে একটু কিছু মুখে দিয়েই...

"তোমার আর এক পি জিকে তো দেখলামই না মা?"

"উঁ? "করবী সম্বিতে ফিরল, "সে তো সুন্দরবন গেছে।"

"কেন? বাড়ি বহরমপুরে না?"

"ও একটু অন্য ধরনের মেয়ে। সোশাল ওয়র্ক-টোয়র্ক করে।"

"অ...তা এদের কিন্তু বেশি দিন রেখো না। বছর পুরলেই ভাগিয়ে দিও।"

"কেন?"

"নতুন পি জি নেবে। মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী রেটও বাড়িয়ে দেবে।"

"যাঃ, এরা পড়াশোনা করছে, হুট করে যেতে বলা যায় নাকি?"

"বি প্র্যাক্টিকাল মা। ব্যবসা যখন করছ, প্রফেশনাল হও। যদি এদেরই রাখো, বছর গেলে চার্জ বাড়িয়ে দেবে। অ্যাটলিস্ট টেন পার্সেন্ট," রাজা ফের স্বচ্ছন্দ হয়েছে। হেসে বলল, "নইলে দেখবে ডেফিসিটে চলে গেছ!"

করবী ফ্যাকাসে হাসল। কত বছর ধরেই তো তারা স্বামী-স্ত্রী লোকসানের বোঝা বইছে। হাসিটাকে সামান্য টেনে করবী একটা সহজ সুর আনল গলায়, "তোকে ওসব ভাবতে হবে না। রসগোল্লাটা খা, ওতে কোনও তেল-মশলা নেই।"

রাজা মুচকি হেসে বলল, "শুধুই ক্যালরি!"

"হ্যাঁ, তোর কাজে লাগবে। ফেরার পথে অনেকটা শক্তিক্ষয় হবে কিনা!"

চলে গেছে রাজা। তাকে ব্যালকনি থেকেই বিদায় জানিয়ে করবী ঘরে একটু শুয়েছিল।

প্রতিমা এসে ডাকল, "মামী, খাবার দিয়েছি।"

উঠল করবী। চোখের কোলটা মুছে নিয়ে বলল, "ওদের বলেছিস?"

"হ্যাঁ। মামা বসে গেছে। সম্পূর্ণাদি কিছু খাবে না।"

"কেন?"

"তার নাকি গা ম্যাজ-ম্যাজ করছে। মুখে রুচি নেই।"

"ও।"

করবী আর কিছু না বলে টেবিলে এল। অনুব্রত মালাইকারির বাটিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। দেখে করবী বলল, "ইচ্ছে করছে কি খেতে?"

"নাঃ, ভাবছিলাম, কাল তো সেই খেতেই হবে, বাসি হয়ে যাবে...খুব ফ্রেশ গলদা এনেছিলাম তো!"

"কায়দা মারছ কেন? খাও। তবে পেট বুঝে।"

"আমি এখন ফার্স্ট ক্লাস। ওই বিনুনির ডাক্তারটা যা ওষুধ দিয়েছে, অম্বল চোঁয়া ঢেকুর, সব ভোঁ ভাঁ। আর টাচউড, সকালে যা চমৎকার সাফ হচ্ছে..."

মন ভাল নেই করবীর, তবু হেসে ফেলল। বিতান ছেলেটার একটা নাম দিয়েছে বটে! ছেলেটাকে অনুব্রতর বেশ পছন্দ। রূপসা একদিন ধরে এনেছিল, টানা দু' ঘণ্টা ধরে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে তার কী বকবক, কী বকবক! গানের দল গড়ে সেটাকে মোটামুটি দাঁড় করাতে কত ধরনের যে বাধাবিঘ্ন পেরতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, সে গল্পও করছিল রসিয়ে-রসিয়ে। অনুব্রতর মতো জন্মনিন্দুকও সেদিন রাতে স্বীকার করল, ছেলেটার মধ্যে জোশ আছে।

হাসতে-হাসতেই করবী চোখ পাকাল, "রূপসার সামনে যেন বিনুনি বলে বোসো না। ওর হয়তো খারাপ লাগতে পারে।"

"থাম তো। ওই বিনুনি দেখেই তো রূপসা মজেছে।"

"আস্তে, আস্তে। গাঁকগাঁক কোরো না। ঘরে সম্পূর্ণা রয়েছে, শুনতে পাবে।"

অনুব্রত যেন সামান্য থতমত। চিংড়ি মাছ পাতে তুলেও থমকাল। তারপর কুরে-কুরে বের করছে মাছের ঘিলু। খানিক আত্মগত ভাবেই বলল, "মেয়েটা তো আজ খেতেই এল না।"

"তাই তো দেখছি। খুব স্ট্রেন যাচ্ছে নাকি? ধকল নিতে পারছে না?"

"হয়তো।"

"মেয়েটা কিন্তু এত দুবলা ছিল না। ক্লাস, পরীক্ষা, সবই তো সামলাচ্ছিল। আজকাল দেখি প্রায়ই কেতরে পড়ছে।"

"হুম।"

"তোমার কিন্তু একবার দেখা উচিত। যদি ডাক্তার-ফাক্তার দেখানোর দরকার হয়..."

"হুঁ, ভাবছি।"

তৃপ্তি সহকারে চিংড়িমাছ পেটে চালান করেই অনুব্রতর খাওয়া শেষ। মুরগির স্টু ছুঁলই না। আঁচিয়ে একটা টুথপিক জোগাড় করল। দাঁত খোঁচাতে-খোঁচাতে টিভি চালিয়ে বসেছে। অভ্যাস মতো করবীও গেল। এই সময়ে তার একটা পছন্দের সিরিয়াল থাকে, সেটাতে ঘুরিয়ে দিল অনুব্রত। দেখছে করবী, কিন্তু যেন মন বসছে না। রাজা নয়, সম্পূর্ণাই ভাবাচ্ছে তাকে। তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে, একটা কোনও গোলমেলে ব্যাপার চলছে। প্রেমে পড়া বিচিত্র নয়। হয়তো প্রেমিকের সঙ্গে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে আসে। তবে তাতে তো এত বিমর্ষ থাকার কথা নয়! যদি বাইরে খেয়ে-টেয়েও আসে, আগে ফোন করে দেয় না কেন?

অনুব্রত ঘুমনোর পর সম্পূর্ণাদের ঘরে এল করবী। ঢুকেই অবাক। টিউবলাইট নেবানো, কিন্তু টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। সম্পূর্ণা অদ্ভুত ভঙ্গিতে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে।

করবী আস্তে ঠেলল। ওমনি থরথর কেঁপে উঠল শরীরটা। উঠে বসেছে ধড়মড়িয়ে। চোখ করমচার মতো লাল।

বিস্মিত স্বরে করবী বলল, "কাঁদছিলে নাকি?"

"কই না তো!" সম্পূর্ণা নাক টানল। চোখ মুছছে দ্রুত। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, "কাঁদব কেন?"

"কী হয়েছে তোমার বলো তো?" করবীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, "কী করে বেড়াচ্ছ, অ্যাঁ?"

"কী করেছি? কই, কিছু না তো।"

"দেখো, আমাকে কিন্তু ফাঁকি দিতে পারবে না। তোমার ভাবগতিক চালচলন, আমার নজরে পড়ছে।" করবীর স্বর আরও কঠোর, "আমি কিন্তু তোমার বাবাকে সব জানাতে বাধ্য হব।"

"না, না, বাবাকে কিছু বলবেন না, প্লিজ।"

"কী বলব না? তুমি পড়াশোনা না করে শুয়ে-শুয়ে কেঁদে ভাসাবে... এরপর হয়তো একটা কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে বসবে! তখন তো তোমার বাবা এসে আমায় দুষবেন, ভরসা করে মেয়েটাকে আপনার হাতে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলাম..." করবী মাথা ঝাঁকাচ্ছে, "না, না, আমার ডিউটি করতেই হবে। জানাতেই হবে তোমার বাবাকে।"

"প্লিজ মাসিমা, আপনার দুটো পায়ে পড়ি!" সত্যি-সত্যি করবীর হাঁটু চেপে ধরেছে সম্পূর্ণা, "বাবা মরে যাবে, বাবা মরে যাবে..."

"সে কী কথা?" করবী স্তম্ভিত, "কী এমন দুষ্কর্ম তুমি করছ? কোনও খারাপ চক্রে জড়িয়ে যাওনি তো?"

"না...মানে হ্যাঁ..." সম্পূর্ণা তোতলাচ্ছে, "আমি বড় বিপদের মধ্যে আছি।"

"কী বিপদ?"

"সে আপনাকে বলা যাবে না। প্লিজ জানতে চাইবেন না।"

"আশ্চর্য তো! বলছ বিপদ, এদিকে ঝেড়ে কাশছ না!" করবী আপনমনে বিড়বিড় করল, "আমাকে থানা-পুলিশ করতে হবে দেখছি।"

আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে সম্পূর্ণার মুখ। বসে-বসেই হাঁপাচ্ছে। জোরে-জোরে নাড়ছে মাথা। আচমকাই ডুকরে উঠল। করবীর হাঁটু আঁকড়ে ভেঙে পড়েছে কান্নায়।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না করবী। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সম্পূর্ণা যা বলল এতক্ষণ, তা কি সত্যি? কাগজে-টাগজে এরকম শয়তানির ঘটনা পড়েছে বটে, কিন্তু তার বাড়িতে বাস করা একটি মেয়ে আপন মামাতো দাদার লালসার শিকার? এখনও সেই দাদা ভোগ করে চলেছে মেয়েটিকে? ভয় দেখিয়ে? করবী তো এ জিনিস চলতে দিতে পারে না। সম্পূর্ণাকে সে ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারে, তাতে হয়তো করবী দায়মুক্তও হবে, কিন্তু সমস্যা মিটবে কী? সব জেনেও মেয়েটাকে ঠেলে দেবে নরকের দরজায়? দোষ হয়তো সম্পূর্ণার আছে, তা বলে শয়তানটার যৌন ক্রীতদাসী হয়ে থাকার মতো অপরাধ তো সে করেনি। মেয়েটা লেখাপড়ায় এত ভাল, একটা মাত্র ভুলের জন্য তার জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে? যেখানেই যাক সম্পূর্ণা, ওই লম্পটটা তো ওর পিছু ছাড়বে না, মেয়েটা বাঁচবে কীভাবে? আত্মহত্যাই কি ওর নিয়তি?

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল করবী। সে করবেটাই বা কী? মোক্ষম একটা ব্যবস্থা নেওয়াই যায়। সকালে অনুব্রতকে যদি খুলে বলে, খেপে অগ্নিশর্মা হয়ে যাবে লোকটা। তখনই দৌড়বে থানায়। পুলিশ নিশ্চয়ই বসে থাকবে না, ছেলেটাকে তো ধরবেই, উত্তমমধ্যম তো দেবেই এবং তার শ্রীঘর বাসও অনিবার্য। কিন্তু পুলিশের নাম শুনলেই যা হিস্টেরিক হয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণা! লোক জানাজানির ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। সম্পূর্ণার বাবাকে জানিয়ে সত্যিই তো লাভ নেই, মেয়ের বিপন্নতা বুঝে তিনি হয়তো সম্পূর্ণার লেখাপড়াটাই বন্ধ করে দেবেন। সবচেয়ে বড় কথা, খবরটা প্রকাশ হলে সম্পূর্ণার ভবিষ্যৎটাই তো অন্ধকার। মেয়েটার বিয়ে হওয়াও তো কঠিন তখন।

তা হলে উপায়?

হঠাৎই মাথায় বিদ্যুতের ঝলক। করবী আবার এসেছে সম্পূর্ণার ঘরে। পাথরের মতো বসে আছে মেয়েটা, শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে ঢলঢলে মুখখানা। করবী গম্ভীর গলায় বলল, "তোমার মোবাইল ফোনটা দাও।"

"কেন?"

"যা বলছি, করো। তোমার বড়মামা ডাক্তার বললে না?"

"হ্যাঁ।"

"কী নাম?"

"মল্লিনাথ সরকার।"

"তোমার ফোনবুকে মামার নাম্বার আছে নিশ্চয়ই? রিং করো। বাজলে ফোন আমায় দাও।"

"এখন? এত রাতে? কেন?" ভয়ার্ত গলায় সম্পূর্ণা বলল, "মামা ভীষণ রেগে যাবে।"

"কথা তো আমি বলব। তুমি শুধু নাম্বারটা ধরো। যদি সুইচ অফ থাকে, তা হলে ল্যান্ডলাইনে করো।"

মোবাইলই বাজছে। বেজেই চলেছে। একসময়ে ওপারে বিরক্ত গলা, "আঃ, কে? রাত্তিরে আমি কলে যাই না।"

"আসার দরকার নেই," করবী কেটে-কেটে বলল, "আমি কলকাতা থেকে কথা বলছি। আমার নাম করবী মিত্র। এই নাম্বারটা আপনার ভাগনি সম্পূর্ণা সোমের।"

ও প্রান্ত চুপ। বেশ খানিকক্ষণ পর স্বর ফুটেছে, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

"আপনার গুণধর ছেলেটির মোবাইলে সম্পূর্ণার কিছু অশ্লীল ছবি আছে। কীভাবে এসেছে, তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন? এখন আপনার ছেলে ছবিগুলো দেখিয়ে সম্পূর্ণাকে ব্ল্যাকমেল করছে। নিয়মিত তাকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। আমি চাই, আপনি ব্যাপারটা বন্ধ করুন। যদি আপনার ছেলে আর কোনওদিন কোনওভাবে সম্পূর্ণাকে ভয় দেখায় কিংবা তার ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষে, আমি কিন্তু পুলিশে যাব। জানাব, সব কিছুই ঘটছে আপনার জ্ঞাতসারে।"

"না, না, ছি ছি, এসব নোংরামিকে আমি কেন প্রশ্রয় দেব?" মল্লিনাথের কণ্ঠ মাখনের মতো নরম, আমি এখনই শায়েস্তা করছি ছেলেকে। এখনই।"

"করুন। তাতে আপনারই মঙ্গল। বাপ-ছেলেকে একসঙ্গে কোমরে দড়ি পরা অবস্থায় দেখাটা কিন্তু খুব সুখদায়ক দৃশ্য হবে না...এ-ও জেনে রাখুন কলটা কিন্তু আমার রেকর্ড করা থাকছে!"

"আমি তো কথা দিচ্ছি, পুনির আর কিচ্ছু হবে না। চিনু তো বোধহয় কলকাতায়, ও আসুক কাল। ওর হাড় না যদি আমি গুঁড়ো-গুঁড়ো করেছি। চিনুর ওই মোবাইল আমি ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দেব। ছিঃ, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে!"

করবী ফোনটা কেটে দিল। সম্পূর্ণা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে।

এক পা, এক পা করে সম্পূর্ণার কাছে গিয়ে দাঁড়াল করবী। হঠাৎই সপাটে চড় কষিয়ে দিল সম্পূর্ণার গালে। অনেক বছর আগে ছোটুর নামে নালিশ এসেছিল স্কুল থেকে। অসভ্যতা করার অপরাধে। তখন এরকমই একটা চড়...

মনে পড়তেই করবী আঁকড়ে ধরল সম্পূর্ণাকে। হাউ-হাউ করে কাঁদছে।

ইলিশমাছটার সাইজ নেহাত মন্দ নয়। ভালই ওজন, এক কিলো দু'শো। তবু কেনার পর মন খুঁতখুঁত করছিল অনুব্রতর। জ্যৈষ্ঠ চলছে, এখনও বর্ষার নামগন্ধ নেই, বৃষ্টির জল গায়ে না পড়লে কি ইলিশের স্বাদ হয়! বাংলাদেশের মাছ বলে তো গছাল, দামও নিল আগুনছোঁয়া, ডাহা ঠকাল কিনা কে জানে! করবী এমন অবুঝপনা করে! গতকাল সম্পূর্ণার সেকেন্ড সেমেস্টারের থিয়োরি পেপার শেষ হল, পরীক্ষার টেনশনে মেয়েটা ক'দিন কিছু খেতেই পারেনি, সুতরাং আজ একটা ভোজ হোক। আর ভোজ মানেই নাকি ইলিশ! কেন রে বাবা, পাঁঠার মাংস রাঁধলে হত না? ডাক্তারের বারণে ওই সুখাদ্যটি তো প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। সম্পূর্ণার নাম করে অনুব্রতও নয় খেত দু-চার পিস।

অনুব্রত ঘুরছিল বাজারে। ইলিশমাছের হ্যাপা তো কম নয়, চচ্চড়ির জোগাড়যন্ত্রও নেওয়া চাই। পুঁইশাক, কুমড়ো, রাঙাআলু বেগুন, আরও কী যেন দেয়? হ্যাঁ, মুলো। অনুব্রত মনে করে করে নিচ্ছিল শাকসবজি। অসময়ের মুলোটা মোটেই পছন্দ হল না, তবু কি আর করা। ছোট্ট তো শীতের মুলোও পছন্দ করত না, তরকারিতে মুলো দেখলেই হাঁ-হাঁ চেঁচাত। সেই ছেলে এখন সোনামুখ করে মুলোর পরোটা খায়। গতবার বেঙ্গালুরুতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখল কিনা, নইলে অনুব্রতর বিশ্বাসই হত না। এখন তো সে নিজস্ব জীবনযাপন করছে, আরও কত যে বদল ঘটবে তার!

পালটায়, পালটায়। সকলেই পালটায়। শুধু অনুব্রত-করবীই যা এক রয়ে গেল। ব্যাকডেটেড সেন্টিমেন্টাল ফুল।

ধুস, কেন যে এখনও ওই সব অকিঞ্চিৎকর ভাবনা তাড়াতে পারে না অনুব্রত? মনের পরতে-পরতে মিশে আছে বলে? করবীকে দেখে অনুব্রতর শিক্ষা নেওয়া উচিত। দিব্যি আক্ষেপগুলো ঝেড়ে ফেলেছে মন থেকে। সম্পূর্ণার জন্য এই চাই, রূপসার ওই চাই। এর লেখাপড়ায় খবরদারি করছে, ওর রিসার্চ নিয়ে কৌতূহল জুড়ছে। ব্রেকফাস্টের সময়ে গল্প, ডিনার টেবিলে গল্প, ঘরে গিয়ে বকবক। রাজা-ছোটুর নামই আনে না মুখে। ছেলেদের ফোন এলে খুব হেসে-হেসে কথা, ব্যস। ছেড়ে দিলেই অন্য মূর্তি। দুটো একটা ব্যঙ্গ ছুঁড়ে বেবাক ভুলে যায় ছেলেদের। কী করে যে পারে? এতাল-বেতাল ভাবনা নিয়ে অনুব্রত বেরল বাজার সেরে। দেখা হল সমরেন্দ্রর সঙ্গে, হাসল একটু। এই রোদে বাজার বয়ে আর হাঁটতে ইচ্ছে করে না, রিকশা নিয়েছে।

বাড়ির সামনে এসে খানিক অবাক। একটা সাদা অ্যাম্বাসাডর দাঁড়িয়ে। হলুদ নেমপ্লেট। ভাড়ার গাড়ি নিয়ে কে রে বাবা? স্বামীনাথনের কাছে কেউ এল? সাড়ে ন'টা তো বাজে, এখনও অফিস বেরয়নি স্বামীনাথন?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বিস্ময় বাড়ল আরও। কোল্যাপসিবল গেট হাট করে খোলা! দোতলার মুখটায় দাঁড়িয়েছিল প্রতিমা। যেন অনুব্রতরই প্রতীক্ষায়। কয়েক ধাপ নেমে এসে ফিসফিস করে বলল, "বাড়িতে পুলিশ এসেছে মামা!"

অনুব্রতর গলা দিয়ে শব্দ ঠিকরে এল, "কীইই?"

"হ্যাঁ মামা। রূপসাদিদির কাছে। কীসব জিজ্ঞেস করছে। মামীকেও..."

থলি দু' খানা প্রতিমার হাতে ধরিয়ে অনুব্রত দ্রুত উঠে এল দোতলায়। চোখ পড়ল বাইরের ঘরে। সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা দুই ভদ্রলোক বসে।

ভিতরে ঢুকে অনুব্রত সরাসরি জিজ্ঞেস করল, "আপনারা...?"

একজন উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, "আমরা রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে এসেছি। আপনাদের পি জি রূপসা সেনকে কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। বাই দা বাই, আপনিই তো গৃহস্বামী?"

"হ্যাঁ, অনুব্রত মৈত্র।"

করবীর মুখে ঘন উদ্বেগ। কিন্তু রূপসা নির্বিকার। রূপসার পাশে গিয়ে বসল অনুব্রত। আলগা চোখ বোলালো দুই আগন্তুকের দিকে। দু'জনের বয়স চল্লিশের কোঠায়, দু'জনেই অভিব্যক্তিহীন। একজনের সরু গোঁফ, অন্যজনের মুখ নিখুঁত কামানো।

দণ্ডায়মান গোঁফধারীকে অনুব্রত বলল, "দাঁড়িয়ে কেন, বি সিটেড প্লিজ।

"আপনারা রূপসার ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?"

"ওটা কোনও ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার নয়," অন্যজন গলা ঝেড়ে বলল, "যে উদ্দেশ্যে এসেছি, সেটাই আসল। নিশ্চয়ই খবরে দেখেছেন, এ মাসের তেরো তারিখে ওয়েস্ট বেঙ্গল-ঝাড়খণ্ড বর্ডারের কাছে একটা মাইন ব্লাস্ট হয়েছে?"

"হ্যাঁ, চারজন পুলিশ ইনজিওর্ড হয়েছিল। একজন বোধ হয় মারাও গেছে।"

"আমরা ওই ঘটনাটারই তদন্ত করছি।"

"কিন্তু রূপসার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?"

"সেটাই তো আমরা খতিয়ে দেখছি," বলেই সিআইডি অফিসার রূপসার দিকে ফিরেছে, "ম্যাডাম, যা বলছিলাম...আপনি তা হলে ষোলই মে ওই ইন্সিডেন্টের স্পটে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। তবে ঠিক অকুস্থলে নয়, তার আশেপাশের গ্রামগুলোতে। কারণ, আমরা খবরে দেখছিলাম, ওই ঘটনাটি যারা ঘটিয়েছে, তাদের খোঁজার নাম করে পুলিশ গ্রামবাসীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাচ্ছিল।"

"আমরা মানে?"

"অধ্যাপক অনিমেষ মাইতি, ডাক্তার সজল হাজরা, আর আমি।"

"আপনারা কী করছিলেন ওখানে?"

"গ্রামবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তাদের আইনি অধিকারগুলো বোঝাচ্ছিলাম। পুলিশি নিপীড়নের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা বলছিলাম..." রূপসার ঠোঁটের কোণে চিলতে বিদ্রুপ, রাষ্ট্রীয় হিংসা প্রতিরোধে আমরা যে প্রায়শই এ ধরনের কাজ করে থাকি, তা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা দপ্তরের অজানা নয়। গত মাসেই তো বাসন্তীতে একটা রাজনৈতিক খুন হয়েছিল। পুলিশ তিনজন নিরপরাধ লোককে থানায় তুলে নিয়ে পিটিয়েছিল বেধড়ক। আমরা তখন সেখানেই গিয়েছিলাম।"

"জানি। কিন্তু আমাদের কাছে যে আরও কিছু খবর আছে," এবার গোঁফধারীর পালা, "যেমন ধরুন, ষোলোই যে আপনারা ওখানে গিয়েছিলেন একেবারে ভিন্ন উদ্দেশ্যে। যারা দুষ্কর্ম ঘটিয়েছে, তাদের আড়াল করতে। গ্রামবাসীদের শেখাতে, যাতে তারা অপরাধীদের নাম না বলে।"

"তার জন্য ঘটনার তিনদিন পরে কেউ যায়? তাও গোপনে নয়, প্রকাশ্যে। এমনকী, আমরা স্থানীয় থানায় গিয়েও প্রতিবাদলিপি জমা দিয়ে এসেছি।"

একটু থেমে থেকে গোঁফধারী বলল, "কিন্তু এই অভিযোগও তো আছে, আপনারা অনেকদিন ধরেই রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত! বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের নাশকতামূলক কাজকর্মের সঙ্গে আপনাদের যোগ ছিল।"

"কী আজেবাজে বকছেন?" অনুব্রত প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "রূপসা মোটেই ওসবে নেই।"

লোকটার দৃষ্টি অনুব্রতর ঘুরল, "আপনারা ওঁকে কতদিন চেনেন?"

"প্রায় দশ মাস তো বটেই।"

"ব্যস, তাতেই সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছেন? ওঁর অতীত ইতিহাস জানেন?"

"অবশ্যই। রূপসা আমাদের কিছুই লুকোয়নি। নবদিশা নামে এক স্টাডি সার্কলের মেম্বার। ওরা সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। এই করতে গিয়ে একটা রাজনৈতিক দলকে ওরা চটিয়েছিল, তাদের লোকজনরা ওকে যাদবপুরের মেস থেকে তাড়ায়।"

"ওটা তো রূপসাদেবীর ভার্শন, আপনি ভেরিফাই করেছেন কখনও?"

"প্রয়োজন বোধ করিনি। সত্যি-মিথ্যের তফাত আমি বুঝতে পারি," এ ব্যাপারে নিজের মনেই তো খচখচ ছিল অনুব্রতর, কেন যে হঠাৎ উলটো গান গেয়ে বসল! ভারিক্কি স্বরে অনুব্রত বলল, "যেমন এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি, আপনারা স্রেফ অকারণে রূপসাকে হ্যারাস করতে এসেছেন।"

একটুও হেলদোল হল না লোকদুটোর। শুধু নিষ্প্রাণ স্বরে গোঁফধারী বলল, "প্লিজ, আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করবেন না। তা হলে বাধ্য হয়ে ম্যাডামকে আমাদের অফিসে নিয়ে যেতে হবে।"

করবী চাপা স্বরে অনুব্রতকে বলল, "আঃ, তুমি চুপ করো। ওঁদের যা জানার আছে, জেনে নিতে দাও।"

অগত্যা মুখে কুলুপ আঁটতেই হয়। তবে ভিতরে-ভিতরে বিরক্তি দানা বাঁধছিল অনুব্রতর। দুই গোয়েন্দার সামনে রূপসা এতই অচঞ্চল, এ কি কোনও অপকর্মে যুক্ত থাকতে পারে? কেন যে মেয়েটাকে এরা এত উত্ত্যক্ত করছে!

ফের জেরা শুরু করেছে সিআইডি অফিসার, "আচ্ছা রূপসাদেবী, আপনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রনীল রায়কে চেনেন?"

"হ্যাঁ, নবদিশার বর্তমান সভাপতি।"

"আপনাদের নবদিশা যে উগ্রপন্থী কার্যকলাপে মদত দেয়, এটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন?"

"স্বীকারও করব না, ডিনাইও করব না। কারণ, আমি তো আর এখন নবদিশায় নেই," রূপসা দৃঢ় গলায় বলল, "গত মার্চে ইন্দ্রনীল রায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তারপরই আমরা স্টাডি সার্কল ছেড়ে দিই, আমরা, মানে, যারা ১৬ মে হাতিশালে গিয়েছিলাম, সেই তিনজন।"

"কেন?"

"আমাদের সঙ্গে ওদের চিন্তাভাবনা মিল ছিল না।"

"ওদের মানে? একজন তো বুঝলাম ইন্দ্রনীল রায়, বাকিরা কে?"

"সরি অফিসার, আমি পুলিশের ইনফর্মারের কাজ করি না। আপনি যদি বিশেষ কারও নাম করেন, আমি যদি তাকে চিনি, তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমার মত জানাব। কিন্তু নিজে থেকে কারও নাম বলে তাকে পুলিশি হুজ্জোতের মধ্যে ঠেলতে পারব না।"

"বটে? তা হলে একটা খবর দিই? মাইন ব্লাস্টের সম্ভাব্য আসামী হিসেবে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঝাড়গ্রামে। তাদেরই মোবাইলে পাওয়া নাম্বারের ভিত্তিতে কলকাতায় একজনকে ধরা হয়েছে। কলকাতায় যিনি অ্যারেস্ট হয়েছেন, তাঁর মোবাইলে আপনার নাম্বার পাচ্ছি।"

"তাতে কী এসে গেল?" অনুব্রত ফের নাক গলিয়েছে, "এবার তো রূপসার মোবাইলে আমাদের নাম্বারও পাবেন। তখন কী সম্ভাব্য উগ্রপন্থীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে আমাদেরও টানাটানি করবেন?"

"দরকারে করতেও পারি।"

"দেখুন চেষ্টা করে। পরে সামাল দিতে পারবেন তো? বয়স্ক নিরীহ দম্পতিকে অকারণে ভয় দেখানোর চার্জ আনব কিন্তু!" ডিভিসির চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পুরনো মেজাজটা যেন ফিরে এসেছে অনুব্রতর। ভারী গলায় বলল, "মোবাইলে কারওর নাম্বার থাকাটা নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ নয়? রূপসা যা-যা বলল, আগে সেগুলো যাচাই তো করুন। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আপনাদের কথা দিচ্ছি, রূপসা এখানেই থাকবে। তেমন প্রমাণ পেলে আপনারা ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবেন।"

গোঁফহীন লোকটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, আমরা ওঁকে ধরতে আসিনি। শুধু বুঝতে চাইছিলাম, উনি এসবে জড়িয়ে আছেন কিনা। আমরা তো জানি, উনি নামী শিক্ষক নেতা পরিমল সেনের মেয়ে।"

"ওটা আমার পরিচয় নয়," এবার রূপসার গলা বেজে উঠল, "আমি রূপসা সেন, যাদবপুরে পিএইচডি করছি, কিছু সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত...আমাকে সেভাবেই দেখবেন প্লিজ। যদি আমার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তিকর কাজের অভিযোগ থাকে, কারও মেয়ে হিসেবে বিশেষ সুবিধে দাবি করব না।"

দুই সিআইডি অফিসার চোখ চাওয়াচাওয়ি করছে। মিনিটখানেক পর উঠে দাঁড়াল। গোঁফহীন বলল, "অল রাইট, আজ তা হলে চলি। যদি প্রয়োজন হয় আবার..."

"ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম!" অনুব্রত এবার হেসেই বলল, "অনুগ্রহ করে একটা ফোন করে আসবেন। বুঝতেই তো পারছেন, এই বয়সে বাজার করে এসে হঠাৎ বাড়িতে পুলিশ দেখা মোটেই প্লেজেন্ট সাইট নয়।"

নীচে নেমে দুই পুলিশ অফিসারকে গাড়ি অবধি পৌঁছে দিল অনুব্রত। ফিরে দেখল, ঘরে সম্পূর্ণাও হাজির।

ভিতু-ভিতু মুখে সম্পূর্ণা বলল, "আপনার তো খুব সাহস মেসোমশাই। পুলিশের সঙ্গে মুখে-মুখে তর্ক করেন!"

"তেঁএটে বুড়ো কিনা!" কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে অনুব্রত রূপসাকে দেখল, "আমাকে তো তোমরা ওই নামই দিয়েছ, তাই না?"

রূপসা যেন ভারী লজ্জা পেয়েছে। মাথা নামিয়ে নিল।

"থাক, আর মুখ লুকোতে হবে না," অনুব্রত গম্ভীর স্বরে বলল, "১৬ তারিখ ঘোড়াশাল না হাতিশাল কোথায় যেন গিয়েছিলে, বলোনি কেন? তখন তো দিব্যি মিথ্যে বলে দিলে, বাড়ি যাচ্ছ..."

"না...মানে ভাবলাম...আপনারা কিছু মাইন্ড করবেন।"

"এখন পুলিশের মুখ থেকে শুনে বুঝি খুব আহ্লাদিত হলাম?" অনুব্রত অভিভাবকের সুরে বলল, "একটা কথা শুনে রাখো। তুমি প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে, নিজের ভালমন্দ নিশ্চয়ই বোঝো, কী করছ না-করছ, তা নিয়ে আমার কিছু

বলার নেই। কিন্তু আশা করব, কোথায় যাচ্ছ সেটুকু অন্তত বাড়ির লোকদের ঠিক-ঠিক জানিয়ে যাবে।"

"আর ভুল হবে না মেসোমশাই।"

সম্পূর্ণা, রূপসা দু'জনকেই একবার দেখে নিয়ে অনুব্রত ঘরে চলে এল। ঘেমো পাঞ্জাবি ছাড়ছে। গলা উঁচিয়ে চা করতে বলল প্রতিমাকে। বসল খাটে, পাখা চালিয়ে।

করবীও পিছন-পিছন এসেছিল। দেখছে অনুব্রতকে।

ভুরু কুঁচকে অনুব্রত জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবে?"

"ভাবছিলাম, পুলিশকে তো ধমকে ভাগালে। ওরা কিন্তু তোমার উপর চটে রইল।"

"তাতে আমার বয়ে গেল!"

"কিন্তু রূপসা যদি সত্যিই আজেবাজে পলিটিক্সে জড়িত থাকে..."

"দেখ করবী, আমাদের ছেলেমেয়েরা যে সব সময়ে আমাদেরই মনের মতো কাজ করবে, তা তো নয়। তাদের ধ্যানধারণাও হয়তো আমাদের সঙ্গে মিলবে না। তারা যদি কিছু ভুলভ্রান্তিও করে, তার দায় তো আমাদের কিছুটা বইতেই হবে," অনুব্রত ফিকে হাসল, "তা বলে তাদের কি আমরা ঘেঁটি ধরে বের করে দিতে পারি? তুমি সম্পূর্ণাকে বকতে পেরেছ, চড় মারতে পেরেছ, তাড়িয়ে দিতে পেরেছ কি?"

করবী একটুক্ষণ নীরব। তারপর মৃদু স্বরে বলল, "তবুও...রাজার তো এক বন্ধু আছে আইপিএস। লালবাজারের ডেপুটি কমিশনার না কী যেন। ওকে যদি ব্যাপারটা জানিয়ে রাখো, মানে, রূপসা যাতে বিপদে না পড়ে..."

"তা হয় না করবী। আমি আর রাজা-ছোটুর বৃত্তে ঢুকতে চাই না। সমস্যা যদি আসে, নিজেরাই তার মোকাবিলা করব। সেটাও তো একটু অন্য ধরনের বাঁচা, নয় কি?"

করবী কিছু বলল না। বসেছে খাটের প্রান্তে। আঁকিবুকি কাটছে চাদরে।

উত্তরের জানলায় এক ফালি রোদ। কোত্থেকে যে এল আজ? দুপুর গড়ানো অবধি তো একটা ছায়া-ছায়া ভাব থাকে পশ্চিমমুখো এই ঘরটায়। আজ যেন আলো-আঁধারিটা নেই। চিলতে রোদ্দুরই কি শুষে নিচ্ছে আবছায়া?

কাচ বসানো শোকেসের মাথায় দু'খানা ফোটোস্ট্যান্ড। স্কুলব্যাগ কাঁধে ছোটু। ক্রিকেট ব্যাট হাতে রাজা। আলো পড়ে রঙিন ছবি দুটো কেমন বিবর্ণ যেন। ঝাপসা-ঝাপসা।

অনুব্রত ছবি দুটো দেখছিল। করবীও। অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবছ?"

আস্তে-আস্তে দু'দিকে মাথা নাড়ল করবী। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বলল, "আমরা কি আবার বেশি মায়ায় জড়িয়ে যাচ্ছি?"

"কী জানি! তবে, মায়া ছাড়া আর কীসের জন্যই বা বাঁচে মানুষ?"

"কিন্তু এরা আর ক'দিন? পরিযায়ী পাখির মতো এসেছে, ক'দিন ডানা ঝাপটেই তো উড়ে যাবে। তারপর?"

"তারপর...তুমি যদি চাও..."
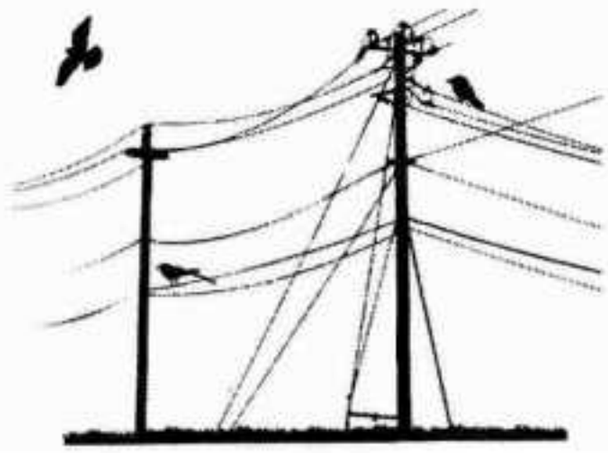
কথাটা শেষ করল না অনুব্রত। না বলা কথাটুকু তবু যেন ভাসছে বাতাসে। বুঝি ছবিদুটোকেও ছুঁয়ে গেল। গোপন দীর্ঘশ্বাসের মতো!